ইউনুস

১০

নামকরণ

যথারীতি ৯৮ আয়াত থেকে নিছক আলামত হিসেবে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ আয়াতে প্রসংগক্রমে হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের কথা এসেছে কিন্তু মূলত এ সূরার আলোচ্য বিষয় হযরত ইউনুসের কাহিনী নয়।

নাযিল হওয়ার স্থান

এ গোটা সূরাটি মক্কা মুয়াযযামায় নাযিল হয়। হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত। সূরার বিষয়বস্তুও এ বক্তব্য সমর্থন করে। কেউ কেউ মনে করেন এর কিছু আয়াত মাদানী যুগে নাযিল হয়। কিন্তু এটা শুধুমাত্র একটা হাওয়াই অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। বক্তব্যের ধারাবাহিক উপস্থাপনা গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার অনুভূত হয়, এগুলো একাধিক ভাষণ বা বিভিন্ন সময় নাযিলকৃত বিভিন্ন আয়াতের সমষ্টি নয়। বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এটা একটা সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ ভাষণ। এটা সম্ভবত এক সাথে নাযিল হয়ে থাকবে এবং এর বক্তব্য বিষয় একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এটা মক্কী যুগের সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়কাল

এ সূরাটি কখন নাযিল হয়, এ সম্পর্কিত কোন হাদীস আমরা পাইনি। কিন্তু এর বক্তব্য বিষয় থেকে বুঝা যায়, এ সূরাটি রাসূলুল্লাহর (সা) মক্কায় অবস্থানের শেষের দিকে নাযিল হয়ে থাকবে। কারণ,এর বক্তব্য বিষয় থেকে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয় যে, এ সময় ইসলামী দাওয়াতের বিরোধীদের পক্ষ থেকে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজ প্রচণ্ডভাবে শুরু হয়ে গিয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে নবী ও তাঁর অনুসারীদেরকে আর বরদাশত করতে রাযী নয়। উপদেশ–অনুরোধের মাধ্যমে তারা সঠিক পথে চলবে, এমন আশা করা যায় না। নবীকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করার ফলে তাদের যে অনিবার্য পরিণতির সম্মুখীন হওয়ার কথা। এখন তা থেকে তাদের সতর্ক করে দেয়ার সময় এসে গেছে। কোন্ ধরনের সূরা মক্কার শেষ যুগের সাথে সম্পর্ক রাখে বক্তব্য বিষয়ের এ বৈশিষ্টই তা আমাদের জানিয়ে দেয়। কিন্তু এ সূরায় হিজরতের প্রতি কোন ইংগিত পাওয়া যায় না। তাই যেসব সূরা থেকে আমরা হিজরতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোন না কোন ইংগিত পাই এ সূরাটির যুগ সেগুলো থেকে আগের মনে করতে হবে। এ সময়–কাল চিহ্নিত করার পর ঐতিহাসিক

পটভূমি বর্ণনা করার প্রয়োজন থাকে না। কারণ, সূরা আনআম ও সূরা আরাফের ভূমিকায় এ যুগের ঐতিহাসিক পটভূমি বর্ণনা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

এ ভাষণের বিষয়বস্তু হচ্ছে, দাওয়াত দেয়া, বুঝানো ও সতর্ক করা। ভাষণের শুরু হয়েছে এভাবে ঃ

একজন মানুষ নবুওয়াতের বাণী প্রচার করছে। তা দেখে লোকেরা অবাক হচ্ছে। তারা অযথা তার বিরুদ্ধে যাদুকরিতার অভিযোগ আনছে। অথচ যেসব কথা সে পেশ করছে তার মধ্যে আজব কিছুই নেই এবং যাদু ও জ্যোতির্বিদ্যার সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কোন বিষয়ও তাতে নেই। সে তো দু'টো গুরুত্বপূর্ণ সত্য তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছে। এক, যে আল্লাহ এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা এবং যিনি কার্যত এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন একমাত্র তিনিই তোমাদের মালিক ও প্রভু এবং একমাত্র তিনিই তোমাদের বন্দেগী ও আনুগত্য লাভের অধিকার রাখেন। দুই, বর্তমান পার্থিব জীবনের পরে আর একটি জীবন আসবে। সেখানে তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা হবে। সেখানে তোমরা নিজেদের বর্তমান জীবনের যাবতীয় কাজের হিসেব দেবে। একটি মৌলিক প্রশ্নের ভিত্তিতে তোমরা শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করবে। সে প্রশ্নটি হচ্ছে, তোমরা আল্লাহকে নিজেদের প্রভু মেনে নিয়ে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সৎকাজ করেছো, না তার বিপরীত কাজ করেছ? তিনি তোমাদের সামনে এই যে সত্য দু'টি পেশ করছেন এ দু'টি যথার্থ ও অকাট্য বাস্তব সত্য। তোমাদের মানা নামানায় এর কিছু আসে যায় না। এ সত্য তোমাদেরকে আহবান জানাচ্ছে যে, একে মেনে নিয়ে সেই অনুযায়ী তোমরা নিজেদের জীবন গড়ে তোল। তার এ আহবানে সাড়া দিলে তোমাদের পরিণাম ভাল হবে। অন্যথায় দেখবে নিজেদের অশুভ পরিণতি।

আলোচনার বিষয়াদি

এ প্রাথমিক আলোচনার পর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো একটি বিশেষ ধারাবাহিকতা সহকারে সামনে আসে ঃ

এক ঃ যারা অন্ধ বিদ্বেষ ও গোঁড়ামীতে লিপ্ত হয় না এবং আলোচনায় হারজিতের পরিবর্তে নিজেরা ভুল দেখা ও ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বাঁচার চিন্তা করে তাদের বুদ্ধি-বিবেককে আল্লাহর একত্ব ও পরকালীন জীবন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার মতো যুক্তি প্রমাণাদি।

দুই ঃ লোকদের তাওহীদ ও রিসালাতের আকীদা স্বীকার করে নেয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যেসব বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল সেগুলো দূর করা এবং যেসব গাফলতি সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া।

তিন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত এবং তিনি যে বাণী এনেছিলেন সেসব সম্পর্কে যে সন্দেহ ও আপত্তি পেশ করা হতো, তার যথাযথ জবাব দান।

চার ঃ পরবর্তী জীবনে যা কিছু ঘটবে সেগুলো আগেভাগেই জানিয়ে দেয়া, যাতে মানুষ সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে নিজের কার্যকলাপ সংশোধন করে নেয় এবং পরে আর তাকে সে জন্য আফসোস করতে না হয়।

পাঁচ ঃ এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া যে, এ দুনিয়ার বর্তমান জীবন আসলে একটি পরীক্ষার জীবন। এ পরীক্ষার জন্য তোমাদের যে অবকাশ দেয়া হয়েছে তা শুধুমাত্র ততটুকুই যতটুকু সময় তোমরা এ দুনিয়ায় শ্বাস–প্রশ্বাস নিচ্ছ। এ সময়টুকু যদি তোমরা নষ্ট করে দাও এবং নবীর হেদায়াত গ্রহণ করে পরীক্ষায় সাফল্য লাভের ব্যবস্থা না করো, তাহলে তোমরা আর দ্বিতীয় কোন সুযোগ পাবে না। এ নবীর আগমন এবং এ কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে সত্য জ্ঞান পৌঁছে যাওয়া তোমাদের পাওয়া একমাত্র ও সর্বোত্তম সুযোগ। একে কাজে লাগাতে না পারলে পরবর্তী জীবনে তোমাদের চিরকাল পস্তাতে হবে।

ছয় ঃ এমন সব সুস্পষ্ট অজ্ঞতা, মূর্খতা ও বিভ্রান্তি চিহ্নিত করা, যা শুধুমাত্র আল্লাহর হেদায়াত ছাড়া জীবন যাপন করার কারণেই লোকদের জীবনে সৃষ্টি হচ্ছিল।

এ প্রসঙ্গে নূহ আলাইহিস সালামের ঘটনা সংক্ষেপে এবং মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। চারটি কথা অনুধাবন করানোই এ ইতিহাস বর্ণনার উদ্দেশ্য।

প্রথমত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তোমরা যে ব্যবহার করছো তা নূহ (আ) ও মূসার (আ) সাথে তোমাদের পূর্ববর্তীরা যে ব্যবহার করেছে অবিকল তার মতই। আর নিশ্চিত থাকো যে, এ ধরনের কার্যকলাপের যে পরিণতি তারা ভোগ করেছে তোমরাও সেই একই পরিণতির সম্মুখীন হবে। দ্বিতীয়ত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাথীদেরকে আজ তোমরা যে অসহায়ত্ব ও দুর্বল অবস্থার মধ্যে দেখছো তা থেকে একথা মনে করে নিয়ো না যে, অবস্থা চিরকাল এ রকমই থাকবে। তোমরা জানো না, যে আল্লাহ মূসা ও হারুণের পেছনে ছিলেন এদের পেছনেও তিনিই আছেন। আর তিনি এমনভাবে গোটা পরিস্থিতি পাল্টে দেন যা কেউ চিন্তাও করতে পারে না। তৃতীয়ত, নিজেদের শুধরে নেয়ার জন্য আল্লাহ তোমাদের যে অবকাশ দিচ্ছেন তা যদি তোমরা নষ্ট করে দাও এবং তারপর ফেরাউনের মতো আল্লাহর হাতে পাকড়াও হবার পর একেবারে শেষ মুহূর্তে তাওবা করো, তাহলে তোমাদের মাফ করা হবে না। চতুর্থত, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান এনেছিল তারা যেন প্রতিকূল পরিবেশের চরম কঠোরতা ও তার মোকাবিলায় নিজেদের অসহায়ত্ব দেখে হতাশ হয়ে না পড়ে। তাদের জানা উচিত, এ অবস্থায় তাদের কিভাবে কাজ করতে হবে। তাদের এ ব্যাপারেও সতর্ক হতে হবে যে, আল্লাহ যখন নিজের মেহেরবানীতে তাদেরকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করবেন তখন যেন তারা বনী ইসরাঈল মিসর থেকে মুক্তি পাওয়ার পর যে আচরণ করেছিল তেমন আচরণ না করে।

সবশেষে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ এ আকীদা–বিশ্বাস অনুযায়ী এবং এ পথ ও নীতির ভিত্তিতে এগিয়ে চলার জন্য আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে সামান্যতমও কাটছাঁট করা যেতে পারে না। যে ব্যক্তি এটা গ্রহণ করবে সে নিজের ভাল করবে এবং যে একে বর্জন করে ভুল পথে পা বাড়াবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۝١ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ۝٢ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣

আলিফ–লাম–রা। এগুলো এমন একটি কিতাবের আয়াত যা হিকমত ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ।[১]

মানুষের জন্য এটা কি একটা আশ্চর্যের ব্যাপার হয়ে গেছে যে, আমি তাদেরই মধ্য থেকে একজনকে নির্দেশ দিয়েছি, (গাফিলতিতে ডুবে থাকা) লোকদেরকে সজাগ করে দাও এবং যারা মেনে নেবে তাদেরকে এ মর্মে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের কাছে যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা?[২] *(একথার ভিত্তিতেই কি) অস্বীকারকারীরা বলেছে, এ ব্যক্তি তো একজন সুস্পষ্ট যাদুকর?*[৩]

আসলে তোমাদের রব সেই আল্লাহই, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছ'দিনে, তারপর শাসন কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং বিশ্ব–জগতের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন।[৪] *কোন শাফায়াতকারী (সুপারিশকারী) এমন নেই, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া শাফায়াত করতে পারে।*[৫] *এ আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের রব। কাজেই তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো।*[৬] *এরপরও কি তোমাদের চৈতন্য হবে না?*[৭]

১. এ প্রারম্ভিক বাক্যে একটি সূক্ষ্ম সতর্কবাণী রয়েছে। অজ্ঞ লোকেরা মনে করছিল, নবী কুরআনের নামে যে বাণী শুনাচ্ছেন তা নিছক ভাষার তেলেসমাতী, কবিসুলভ অবাস্তব কল্পনা এবং গণক ও জ্যোতিষীদের মতো উর্ধজগৎ সম্পর্কিত কিছু আলোচনার সমষ্টি মাত্র। তাদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা হচ্ছে যে, তোমাদের ধারণা ঠিক নয়। এগুলো তো জ্ঞানময় কিতাবের আয়াত। এর প্রতি মনোযোগী না হলে তোমরা জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

২. অর্থাৎ এতে অবাক হবার কি আছে? মানুষকে সতর্ক করার জন্য মানুষ নিযুক্ত না করে কি জিন, ফেরেশতা বা পশু নিযুক্ত করা হবে? আর মানুষ যদি সত্য থেকে গাফেল হয়ে ভুল পথে জীবন যাপন করে তাহলে তাদের স্রষ্টা ও প্রভু তাদেরকে নিজেদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবেন অথবা তিনি তাদের হেদায়াত ও পথ দেখাবার কোন ব্যবস্থা করবেন, এর মধ্যে কোন্‌টা বিস্ময়কর? আর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন হেদায়াত আসে তাহলে যারা তা মেনে নেবে তাদের মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী হওয়া উচিত, না যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে তাদের? কাজেই যারা অবাক হচ্ছে তাদের চিন্তা করা উচিত, কি জন্য তারা অবাক হচ্ছে।

৩. অর্থাৎ তারা তাঁকে যাদুকর বলে দোষারোপ করলো কিন্তু এ দোষ তাঁর ওপর আরোপিত হয় কিনা একথা চিন্তা করলো না। কোন ব্যক্তি উন্নত মানের বক্তৃতা ও ভাষণ দানের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিষ্ক জয় করে ফেললেই সে যাদুকরের কাজ করছে এ কথা বলা চলে না। দেখতে হবে এ বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে সে কি বলছে? কি উদ্দেশ্যে তার বাগ্মীতার শক্তি ব্যবহার করছে? এ বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে ঈমানদারদের জীবনে কোন্‌ ধরনের প্রভাব পড়ছে? যে বক্তা কোন অবৈধ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তার বাগ্মীতার অসাধারণ শক্তি ব্যবহার করে সে তো একজন নির্লজ্জ, নিয়ন্ত্রণহীন ও দায়িত্বহীন বক্তা। সত্য, ইনসাফ ও ন্যায়নীতিমুক্ত হয়ে সে এমন সব কথা বলে দেয়, যার প্রত্যেকটি কথা শ্রোতাদের প্রভাবিত করে, তা যতই মিথ্যা অতিরঞ্জিত ও অন্যায় হোক না কেন। তার কথায় বিজ্ঞতার পরিবর্তে থাকে জনতাকে প্রতারণা করার ফন্দী। কোন সুশৃংখল ও সমন্বিত চিন্তাধারার পরিবর্তে সেখানে থাকে স্ববিরোধিতা ও অসামঞ্জস্য। ভারসাম্যের পরিবর্তে থাকে অসমতা। সে নিছক নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বড় বড় বুলি আওড়ায় অথবা বাগ্মীতার মদে মত্ত করে পরস্পরকে লড়াবার এবং এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার জন্য উস্কানি দেয়। লোকদের ওপর এর যে প্রভাব পড়ে তার ফলে তাদের কোন নৈতিক উন্নতি সাধিত হয় না এবং তাদের জীবনে কোন শুভ পরিবর্তনও দেখা দেয় না। অথবা কোন সৎচিন্তা কিংবা সৎকর্মময় পরিবেশ জন্ম লাভ করে না। বরং লোকেরা আগের চাইতেও খারাপ চরিত্রের প্রদর্শনী করতে থাকে। অথচ এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছো, নবী যে কালাম পেশ করছেন তার মধ্যে রয়েছে সুগভীর তত্বজ্ঞান, একটি উপযোগী ও সমন্বিত চিন্তা ব্যবস্থা, সর্বোচ্চ পর্যায়ের সমতা ও ভারসাম্য, সত্য ও ন্যায়নীতির কঠোর ব্যবস্থাপনা। প্রতিটি শব্দ মাপাজোকা এবং প্রতিটি বাক্য পাল্লায় ওজন করা। তাঁর বক্তৃতায় মানুষের সংশোধন ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা যেতে পারে না। তিনি যা কিছু বলে থাকেন তার মধ্যে তাঁর নিজের, পরিবারের, জাতির বা কোন প্রকার দুনিয়াবী স্বার্থের কোন গন্ধই পাওয়া যায় না। লোকেরা যে গাফলতির মধ্যে ডুবে আছে তিনি শুধু তাদেরকে তার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেন এবং যে পথে

তাদের নিজেদের কল্যাণ সে দিকে তাদেরকে আহবান জানান। তারপর তার বক্তৃতার যে প্রভাব পড়ে তাও যাদুকরদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। এখানে যে ব্যক্তিই তার প্রভাব গ্রহণ করেছে তার জীবনই সুন্দর ও সুসজ্জিত হয়ে উঠেছে। সে আগের তুলনায় উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয়েছে। তার সকল কাজে কল্যাণ ও সৎবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠেছে। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো, সত্যিই কি যাদুকর এমন কথা বলে এবং তার যাদুর ফলাফল কি এমনটিই হয়?

৪. অর্থাৎ সৃষ্টি করার পরে তিনি নিষ্ক্রীয় হয়ে যাননি। বরং নিজের সৃষ্ট বিশ্ব–জাহানের শাসন কর্তৃত্বের আসনে নিজেই সমাসীন হয়েছেন এবং এখন সমগ্র জগতের ব্যবস্থাপনা কার্যত তিনিই পরিচালনা করছেন। অবুঝ লোকেরা মনে করে, আল্লাহ বিশ্ব–জাহান সৃষ্টি করে তারপর একে এমনিই ছেড়ে দিয়েছেন। যে যেভাবে চায় চলতে পারে। অথবা একে অন্যদের হাওয়ালা করে দিয়েছেন। তারা যেভাবে চায় একে চালাতে ও ব্যবহার করতে পারে। এ ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত কুরআন যে সত্য পেশ করে তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁর এ সৃষ্টিজগতের সমগ্র এলাকায় নিজেই শাসন কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। এখানকার সমগ্র ক্ষমতার তিনিই একচ্ছত্র মালিক। সমগ্র কর্তৃত্ব তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। বিশ্ব–জাহানের বিভিন্ন স্থানে প্রতি মুহূর্তে যা কিছু হচ্ছে তা সরাসরি তাঁর হুকুম বা অনুমতিক্রমে হচ্ছে। এ সৃষ্টি জগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক শুধু এতটুকুই নয় যে, তিনি এক সময় একে সৃজন করেছিলেন বরং তিনিই সর্বক্ষণ এর পরিচালক ও ব্যবস্থাপক, একে তিনিই প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন বলেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তিনি চালাচ্ছেন বলেই চলছে। (দেখুন সূরা আ'রাফ, ৪০ ও ৪১ টীকা)।

৫. অর্থাৎ দুনিয়ার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় অন্য কারোর হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা, কারোর আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে তাঁর কোন ফায়সালা পরিবর্তন করার অথবা কারোর ভাগ্য ভাঙা গড়ার ইখতিয়ারও নেই। বড়জোর সে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে। কিন্তু তার দোয়া কবুল হওয়া না হওয়া পুরাপুরি আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর এ একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার রাজ্যে নিজের কথা নিশ্চিতভাবে কার্যকর করিয়ে নেবার মতো শক্তিধর কেউ নেই। এমন শক্তি কারোর নেই যে, তার সুপারিশকে প্রত্যাখ্যাত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে এবং আল্লাহর আরশের পা জড়িয়ে ধরে বসে থেকে নিজের দাবী আদায় করে নিতে পারে।

৬. ওপরের তিনটি বাক্যে প্রকৃত সত্য বর্ণনা করা হয়েছিল, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদের রব। এখন বলা হচ্ছে, এ প্রকৃত সত্যের উপস্থিতিতে তোমাদের কোন্ ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। মূলত রবুবীয়াত তথা বিশ্ব–জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতা, নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব যখন পুরাপুরি আল্লাহর আয়ত্বাধীন তখন এর অনিবার্য দাবী স্বরূপ মানুষকে তাঁরই বন্দেগী করতে হবে। তারপর রবুবীয়াত শব্দটির যেমন তিনটি অর্থ হয় অর্থাৎ প্রতিপালন ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও শাসন ক্ষমতা ঠিক তেমনি–এর পাশাপাশি ইবাদাত শব্দেরও তিনটি অর্থ হয় অর্থাৎ পূজা, দাসত্ব ও আনুগত্য।

আল্লাহর একমাত্র রব হওয়ার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, মানুষ তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞ হবে, তাঁরই কাছে প্রার্থনা করবে এবং তাঁরই সামনে ভক্তি–শ্রদ্ধা-ভালবাসায় মাথা নোয়াবে। এটি হচ্ছে ইবাদাতের প্রাথমিক অর্থ।

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ④ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑤ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ⑥

তাঁরই দিকে তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।[৮] এটা আল্লাহর পাকাপোক্ত ওয়াদা। নিসন্দেহে সৃষ্টির সূচনা তিনিই করেন তারপর তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন,[৯] যাতে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদেরকে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে প্রতিদান দেয়া যায় এবং যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করে তারা পান করে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নিজেদের সত্য অস্বীকৃতির প্রতিফল হিসেবে।[১০]

তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিশালী ও চন্দ্রকে আলোকময়, এবং তার মনযিলও ঠিকমত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা তার সাহায্যে বছর গণনা ও তারিখ হিসেব করতে পারো। আল্লাহ এসব কিছু (খেলাচ্ছলে নয় বরং) উদ্দেশ্যমূলকভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজের নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে পেশ করছেন যারা জ্ঞানবান তাদের জন্য। অবশ্য দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা (ভুল দেখা ও ভুল আচরণ করা থেকে) আত্মরক্ষা করতে চায়।[১১]

আল্লাহর একমাত্র মালিক ও প্রভু হওয়ার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, মানুষ তাঁর বান্দা ও দাস হয়ে থাকবে, তাঁর মোকাবিলায় স্বেচ্ছাচারী নীতি অবলম্বন করবে না এবং তাঁর ছাড়া আর কারোর মানসিক বা কর্মগত দাসত্ব করবে না। এটি ইবাদাতের দ্বিতীয় অর্থ।

আল্লাহকে একমাত্র শাসনকর্তা বলে মেনে নেবার অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, মানুষ তাঁর হুকুমের আনুগত্য করবে ও তাঁর আইন মেনে চলবে। মানুষ নিজেই নিজের শাসক

হবে না এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারোর শাসন কর্তৃত্ব স্বীকার করবে না। এটি ইবাদাতের তৃতীয় অর্থ।

৭. অর্থাৎ যখন এ সত্য তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ সত্যের উপস্থিতিতে তোমাদের কি কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তখন এরপরও কি তোমাদের চোখ খুলবে না এবং তোমরা এমন বিভ্রান্তির মধ্যে ডুবে থাকবে যার ফলে তোমাদের জীবনের সমগ্র দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি সত্যবিরোধী পথে পরিচালিত হয়েছে?

৮. এটি নবীর শিক্ষার দ্বিতীয় মূলনীতি। প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের রব কাজেই তাঁরই ইবাদাত করো। আর দ্বিতীয় মূলনীতি হচ্ছে, তোমাদের এ দুনিয়া থেকে ফিরে গিয়ে নিজেদের রবের কাছে হিসেব দিতে হবে।

৯. এ বাক্যটির মধ্যে দাবী ও প্রমাণ উভয়েরই সমাবেশ ঘটেছে। দাবী হচ্ছে, আল্লাহ পুনর্বার মানুষকে সৃষ্টি করবেন। এর প্রমাণ হিসেবে বলা হয়েছে, তিনিই প্রথমবার মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আর যে ব্যক্তি একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অবশ্যি শুধুমাত্র পাদরীদের প্রচারিত ধর্ম থেকে দূরে অবস্থান করার লক্ষে স্রষ্টাবিহীন সৃষ্টির মতে নির্বোধ জনোচিত মতবাদ পোষণ করতে উদ্যোগী কিছু নাস্তিক ছাড়া আর কে এটা অস্বীকার করতে পারে! সে কখনো আল্লাহর পক্ষে এ সৃষ্টির পুনরাবৃত্তিকে অসম্ভব বা দুর্বোধ্য মনে করতে পারে না।

১০. এ প্রয়োজনটির ভিত্তিতেই আল্লাহ মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। একই জিনিসের পুনঃসৃজন সম্ভব এবং তাকে দুরধিগম্য মনে করার কোন কারণ নেই, একথা প্রমাণ করার জন্য ওপরে বর্ণিত যুক্তি যথেষ্ট ছিল।

এখন এখানে বলা হচ্ছে, সৃষ্টির এ পুনরাবর্তন বুদ্ধি ও ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে অপরিহার্য। আর এ অপরিহার্য প্রয়োজন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন পথেই পূর্ণ হতে পারে না। আল্লাহকে নিজের একমাত্র রব হিসেবে মেনে নিয়ে যারা সঠিক বন্দেগীর নীতি অবলম্বন করবে তারা নিজেদের এ যথার্থ কার্যধারার পূর্ণ প্রতিদান লাভ করার অধিকার রাখে। অন্যদিকে যারা সত্য অস্বীকার করে তার বিরোধী অবস্থানে জীবন যাপন করবে তারাও নিজেদের এ ভ্রান্ত কার্যধারার কুফল প্রত্যক্ষ করবে। এ প্রয়োজন যদি বর্তমান পার্থিব জীবনে পূর্ণ না হয় (এবং যারা হঠকারী নন তারা প্রত্যেকেই জানেন, এ প্রয়োজন পূর্ণ হচ্ছে না) তাহলে অবশ্যি এটা পূর্ণ করার জন্য পুনরুজ্জীবন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। (আরো বেশী জানার জন্য সূরা আ'রাফ ৩০ টীকা ও সূরা হুদ ১০৫ টীকা দেখুন)।

১১. এটি আখেরাত বিশ্বাসের পক্ষে তৃতীয় যুক্তি। এ বিশ্ব–জাহানের চারদিকে মহান আল্লাহর যেসব কীর্তি দেখা যাচ্ছে, যার বড় বড় নিদর্শন সূর্য, চন্দ্র, দিন ও রাত্রির আবর্তনের আকারে মানুষের সামনে রয়েছে, এগুলো থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন একটা ছোট্ট শিশু এ সৃষ্টি জগতের বিশাল কারখানার স্রষ্টা নয়। সে কোন শিশুর মত নিছক খেলা করার জন্য এসব কিছু তৈরী করেনি আবার খেলা করে মন ভরে যাওয়ার পর এসব কিছু ভেঙে চুরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে না। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তাঁর সব কাজে রয়েছে শৃঙ্খলা, বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য ও কলা কৌশল। প্রতিটি অণুপরমাণু সৃষ্টির

পেছনে পাওয়া যায় একটি লক্ষ্যাভিসারী উদ্যোগ। কাজেই তিনি যখন মহাজ্ঞানী এবং তাঁর জ্ঞানের লক্ষণ ও আলামতগুলো তোমাদের সামনে প্রকাশ্যে মওজুদ রয়েছে, তখন তোমরা তাঁর থেকে কেমন করে আশা করতে পারো যে, তিনি মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিক অনুভূতি এবং স্বাধীন দায়িত্ব ও এসব কিছু ব্যবহারের ক্ষমতা দান করার পর তার জীবনের কার্যক্রম হিসেব কখনো নেবেন না এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক দায়িত্বের কারণে পুরস্কার ও শাস্তি লাভের যে যোগ্যতা অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হয়ে যায় তাকে অনর্থক এমনিই ছেড়ে দেবেন?

অনুরূপভাবে এ আয়াতগুলোতে আখেরাত বিশ্বাস পেশ করার সাথে সাথে তার স্বপক্ষে যৌক্তিক ধারাবাহিকতা সহকারে তিনটি যুক্তি পেশ করা হয়েছে ঃ

এক ঃ দ্বিতীয় জীবন অর্থাৎ পরকালীন জীবন সম্ভব। কারণ, প্রথম অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনের সম্ভাবনা জাজ্বল্যমান ঘটনার আকারে বিরাজমান।

দুই ঃ পরকালীন জীবনের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, বর্তমান জীবনে মানুষ নিজের নৈতিক দায়িত্ব সঠিক বা বেঠিক যেভাবে পালন করে এবং তা থেকে পুরস্কার ও শাস্তিলাভের যে অবশ্যম্ভাবী যোগ্যতা সৃষ্টি হয় তার ভিত্তিতে বুদ্ধি ও ইনসাফ আর একটি জীবনের দাবী করে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নৈতিক কার্যক্রমের উপযুক্ত ফল প্রত্যক্ষ করবে।

তিন ঃ বুদ্ধি ও ইনসাফের দৃষ্টিতে যখন পরকালীন জীবনের প্রয়োজন তখন এ প্রয়োজন অবশ্যি পূর্ণ করা হবে। কারণ, মানুষ ও বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা হচ্ছেন মহাজ্ঞানী। আর মহাজ্ঞানীর কাছে আশা করা যেতে পারে না যে, জ্ঞান ও ইনসাফ যা দাবী করে তিনি তা কার্যকর করবেন না।

গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যাবে, মৃত্যুর পরের জীবনকে যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করতে হলে, এ তিনটি যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনই সম্ভব এবং এ ক্ষেত্রে এগুলো যথেষ্টও। এ যুক্তি-প্রমাণগুলোর পরে যদি আর কিছু অপূর্ণতা থেকে যায় তাহলে তা হচ্ছে মানুষকে চর্ম চোখে দেখিয়ে দেয়া যে, যে জিনিসটি সম্ভব, যার অস্তিত্বশীল হওয়ার প্রয়োজনও আছে এবং যাকে অস্তিত্বশীল করা আল্লাহর জ্ঞানের দাবীও, তাকে মানুষের চোখের সামনে হাযির করে দিতে হবে। কিন্তু বর্তমান দুনিয়াবী জীবনে এ শূন্যতা পূর্ণ করা হবে না। কারণ, চোখে দেখে ঈমান আনার কোন অর্থই হয় না। মহান আল্লাহ মানুষের পরীক্ষা নিতে চান। ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের উর্ধে উঠে নিছক চিন্তা-ভাবনা ও সঠিক যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে মেনে নেয় কিনা, এটাই এ পরীক্ষা।

এ প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি গভীর মনোযোগের দাবী রাখে। বলা হয়েছে, "আল্লাহ তাঁর নিশানীগুলোকে উন্মুক্ত করে পেশ করছেন তাদের জন্য, যারা জ্ঞানের অধিকারী।" আর "আল্লাহর সৃষ্ট প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে নিশানী রয়েছে তাদের জন্য যারা ভুল দেখা ও ভুল পথে চলা থেকে বাঁচতে চায়।" এর মানে হচ্ছে, আল্লাহ অত্যন্ত বিজ্ঞ জনোচিত পদ্ধতিতে জীবনের নিদর্শনাবলীর মধ্যে চতুরদিকে এমন সব চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছেন যা ঐ নিদর্শনগুলোর পেছনে আত্মগোপন করে থাকা সত্যগুলোকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করছে। কিন্তু এ নিদর্শনগুলোর সাহায্যে নিগূঢ় সত্যে একমাত্র তারাই উপনীত হতে পারে যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণ দু'টি আছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَٰتِنَا غَٰفِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَٰنِهِمْ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَٰرُ فِي جَنَّٰتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَٰنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿١٠﴾

এ কথা সত্য, যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত থাকে আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে গাফেল, তাদের শেষ আবাস হবে জাহান্নাম এমন সব অসৎকাজের কর্মফল হিসেবে যেগুলো তারা (নিজেদের ভুল আকীদা ও ভুল কার্যধারার কারণে) ক্রমাগতভাবে আহরণ করতো।[১২]

আবার একথাও সত্য, যারা ঈমান আনে (অর্থাৎ যারা এ কিতাবে পেশকৃত সত্যগুলো গ্রহণ করে) এবং সৎকাজ করতে থাকে, তাদেরকে তাদের রব তাদের ঈমানের কারণে সোজা পথে চালাবেন। নিয়ামত ভরা জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে।[১৩] *সেখানে তাদের ধ্বনি হবে "পবিত্র তুমি যে আল্লাহ!" তাদের দোয়া হবে, "শান্তি ও নিরাপত্তা হোক!" এবং তাদের সবকথার শেষ হবে এভাবে, "সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব-জাহানের রব আল্লাহর জন্য।"*[১৪]

এক ঃ তারা মূর্খতা ও অজ্ঞতাপ্রসূত একগুয়েমী বিদ্বেষ ও স্বার্থ প্রীতি থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞান অর্জন করার এমন সব মাধ্যম ব্যবহার করে যেগুলো আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন।

দুই ঃ তারা ভুল থেকে আত্মরক্ষা ও সঠিক পথ অবলম্বন করার ইচ্ছা নিজেদের অন্তরে পোষণ করে।

১২. এখানে আবার দাবীর সাথে সাথে ইশারা–ইংগিতে তার যুক্তিও বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। দাবী হচ্ছে, পরকালীন জীবনের ধারণা অস্বীকার করার অনিবার্য ও নিশ্চিত ফল জাহান্নাম। এর প্রমাণ হচ্ছে, এ ধারণা অস্বীকার করে অথবা এ ধরনের কোন প্রকার ধারণার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে মানুষ এমন সব অসৎকাজ করে যেগুলোর শাস্তি জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এটি একটি জাজ্বল্যমান সত্য। মানুষ হাজার

হাজার বছর থেকে যে দৃষ্টিভংগি পোষণ এবং যে কর্মনীতি অবলম্বন করে আসছে তার অভিজ্ঞতাই এর সাক্ষ বহন করছে। যারা আল্লাহর সামনে নিজেদেরকে দায়িত্বশীল এবং জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করে না, যারা কখনো নিজেদের সারা জীবনের সমস্ত কাজের শেষে একদিন আল্লাহর কাছে তার হিসেব পেশ করার ভয় করে না, যারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করে যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত কাজ কারবার ও তার হিসাব নিকাশ এ দুনিয়ার জীবনেই শেষ, যাদের দৃষ্টিতে দুনিয়ায় মানুষ যে পরিমাণ সমৃদ্ধি, সুখৈশ্বর্য, খ্যাতি ও শক্তিমত্তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে শুধুমাত্র তারই ভিত্তিতে তার সাফল্য ও ব্যর্থতা বিচার্য এবং যারা নিজেদের বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার কারণে আল্লাহর আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন বোধ করে না, তাদের সারা জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তারা দুনিয়ায় বাস করে লাগামহীন উটের মত। তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট পর্যায়ের চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হয়। পৃথিবীকে জুলুম, নির্যাতন, বিপর্যয়, বিশৃংখলা, ফাসেকী ও অশ্লীল জীবন চর্চায় ভরে দেয়। ফলে জাহান্নামের আযাব ভোগের যোগ্যতা অর্জন করে।

এটি আখেরাত বিশ্বাসের পক্ষে আর এক ধরনের যুক্তি। প্রথম তিনটি যুক্তি ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক। আর এটি হচ্ছে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভিত্তিক। এখানে এটিকে শুধুমাত্র ইশারা ইংগিতে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের অন্যান্য জায়গায় আমরা একে বিস্তারিত আকারে দেখতে পাই। এ যুক্তিটির সারমর্ম হচ্ছে ঃ মানুষের ব্যক্তিগত মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী এবং মানবিক সমাজ ও গোষ্ঠীগুলোর সামষ্টিক মনোভাব ও দৃষ্টিভংগী ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হয় না যতক্ষণ না 'আমাকে আল্লাহর সামনে নিজের কাজের জবাব দিতে হবে' এ চেতনা ও বিশ্বাস মানুষের নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিমূলে গভীরভাবে শিকড় গেঁড়ে বসে। এখন চিন্তার বিষয়, এমনটি কেন? কি কারণে এ চেতনা ও বিশ্বাস বিনষ্ট হওয়া বা দুর্বল হওয়ার সাথে সাথেই মানুষের নৈতিক বৃত্তি ও কর্মকাণ্ড অসৎ ও অন্যায়ের পথে ধাবিত হয়? যদি আখেরাত বিশ্বাস বাস্তব ও প্রকৃত সত্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হতো এবং তার অস্বীকৃতি প্রকৃত সত্যের বিরোধী না হতো, তাহলে তার স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির এ পরিণাম ফল একটি অনিবার্য বাধ্যবাধকতা সহকারে অনবরত আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়তো না। একই জিনিস বিদ্যমান থাকলে সবসময় সঠিক ফলাফল বের হয়ে আসা এবং তার অবর্তমানে হামেশা ভুল ফলাফল দেখা দেয়া চূড়ান্তভাবে একথাই প্রমাণ করে যে, ঐ জিনিসটি আসলে সঠিক।

এর জবাবে অনেক সময় যুক্তি পেশ করে বলা হয় যে, যারা পরকাল মানে না এবং যাদের নৈতিক দর্শন ও কর্মনীতি একেবারেই নাস্তিক্যবাদ ও বস্তুবাদের ভিত্তিতে তৈরী তাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যারা যথেষ্ট পাক পরিচ্ছন্ন চরিত্রের অধিকারী এবং তারা জুলুম, বিপর্যয়, ফাসেকী ও অশ্লীলতার প্রকাশ ঘটান না। বরং নিজেদের লেনদেন ও আচার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা সৎ এবং মানুষ ও সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু এ যুক্তির দুর্বলতা অতি সহজেই স্পষ্ট হয়ে যায়। সমস্ত বস্তুবাদী ধর্মহীন দর্শন ও চিন্তা ব্যবস্থা যাচাই পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, উল্লেখিত 'সৎকর্মকারী' নাস্তিকদেরকে তাদের যে সৎকাজের জন্য এত মোবারকবাদ দেয়া হচ্ছে তাদের ঐসব নৈতিক সৎবৃত্তি ও বাস্তব সৎকাজের পেছনে কোন পরিচালিকা শক্তির অস্তিত্ব নেই। কোন ধরনের যুক্তি

প্রদর্শন করে একথা প্রমাণ করা যাবে না যে, ঐ সমস্ত ধর্মহীন দর্শনে সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, অংগীকার পালন, ইনসাফ, দানশীলতা, ত্যাগ, কুরবানী, সহানুভূতি, আত্মসংযম, চারিত্রিক সততা সত্যানুসন্ধিৎসা ও অধিকার প্রদানের কারণে কোন উদ্দীপক শক্তি সক্রীয় আছে। আল্লাহ ও পরকালকে বাদ দেবার পর নৈতিকবৃত্তির জন্য যদি কোন কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে তাহলে তা গড়ে তোলা যায় একমাত্র উপযোগবাদের (Utilitareanism) অর্থাৎ স্বার্থপরতার ভিত্তিতে। বাদবাকি অন্যান্য সমস্ত নৈতিক দর্শন শুধুমাত্র কাল্পনিক, আনুমানিক ও কেতাবী রচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেগুলো বাস্তবে কার্যকর হবার যোগ্য নয়। আর উপযোগবাদ যে নৈতিক চরিত্র সৃষ্টি করে তাকে যতই ব্যাপকতা দান করা হোক না কেন তা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। বড় জোর তা এতদূর যেতে পারে যে, মানুষ এমন কাজ করবে যা থেকে তার নিজের সত্তার বা যে সমাজে সে বাস করে তার লাভবান হবার আশা থাকে। এটি এমন একটি জিনিস যা লাভের আশা ও ক্ষতির আশংকার ভিত্তিতে মানুষকে সুযোগ মতো সত্য ও মিথ্যা, বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতা, ঈমানদারী ও বেঈমানী, আমানতদারী ও আত্ম-সাৎ,ইনসাফ ও জুলুম ইত্যাকার প্রত্যেকটি সৎকাজ ও তার বিপরীতমুখী মন্দ কাজে লিপ্ত করতে পারে। এ নৈতিক বৃত্তিগুলোর সবচেয়ে ভাল নমুনা হচ্ছে বর্তমান যুগের ইংরেজ জাতি। প্রায়ই এদেরকে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করে বলা হয় যে, বস্তুবাদী জীবন দর্শনের অধিকারী এবং পরকালের ধারণায় বিশ্বাসী না হয়েও এ জাতির ব্যক্তিবর্গ সাধারণভাবে অন্যদের তুলনায় বেশী সৎ, সত্যবাদী, আমানতদার, অংগীকার পালনকারী, ন্যায়নিষ্ঠ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু স্বার্থপ্রণোদিত নৈতিকতা ও সততা যে মোটেই টেকসই হয় না, তার সবচেয়ে সুস্পষ্ট বাস্তব প্রমাণ আমরা এ জাতির চরিত্রেই পাই। সত্যিই যদি ইংরেজদের সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও অংগীকার পালন এ বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতো যে, এ গুণগুলো আদতেই এবং বাস্তবিক পক্ষেই শাশ্বত নৈতিক গুণাবলীর অন্তরভুক্ত, তাহলে এ সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দৃষ্টিভংগী পরস্পরের বিপরীত হয় কেমন করে? একজন ইংরেজ তার ব্যক্তিগত জীবনে এ গুণগুলোতে ভূষিত হবে কিন্তু সমগ্র জাতি মিলে যাদেরকে নিজেদের প্রতিনিধি এবং নিজেদের সামষ্টিক বিষয়াবলীর পরিচালক ও তত্বাবধায়ক মনোনীত করে তারা বৃহত্তর পরিমণ্ডলে তাদের সাম্রাজ্য ও তার আন্তরজাতিক বিষয়াবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে নগ্নভাবে মিথ্যাচার, অংগীকার ভংগ, জুলুম, বে-ইনসাফী ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেয় এবং তার পরও তারা সমগ্র জাতির আস্থা লাভ করে—এটা কেমন করে সম্ভব হয়? তারা যে মোটেই কোন স্থায়ী ও শাশ্বত নৈতিক গুণাবলীতে বিশ্বাসী নয় বরং স্রেফ পার্থিব লাভ-ক্ষতির প্রেক্ষিতেই তারা একই সময় দু'টি বিপরীতধর্মী নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করে থাকে বা করতে পারে, সেটাই কি এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না?

তবুও সত্যই যদি দুনিয়ায় এমন কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব থেকে থাকে, যে আল্লাহ ও পরকাল অস্বীকার করা সত্ত্বেও স্থায়ীভাবে কোন কোন সৎকাজ করে ও অসৎকাজ থেকে দূরে থাকে তাহলে আসলে তার এ সৎপ্রবণতা ও সৎকর্মস্পৃহা তার বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ফল নয়। বরং এগুলো তার এমন সব ধর্মীয় প্রভাবের ফল যা অবচেতনভাবে তার অন্তরাত্মার মধ্যে শেকড় গেড়ে রয়েছে। তার এ নৈতিক সম্পদ ধর্মের ভাণ্ডার থেকে চুরি করে আনা হয়েছে এবং সে একে ধর্মহীনতার মোড়কে অবৈধভাবে ব্যবহার করছে। কারণ

সে তার ধর্মহীনতা ও বস্তুবাদিতার ভাণ্ডারে এ সম্পদটির উৎস নির্দেশ করতে কখনই সক্ষম হবে না।

১৩. এ বাক্যটিকে হালকাভাবে নেবেন না। এর বিষয়বস্তুর ক্রম বিন্যাস গভীর মনোনিবেশের দাবীদার।

পরকালীন জীবনে তারা জান্নাত লাভ করবে কেন? কারণ, তারা পার্থিব জীবনে সত্য পথে চলেছে। প্রত্যেক কাজে, জীবনের প্রতিটি বিভাগে, প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক বিষয়ে তারা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ পথ অবলম্বন করেছে এবং বাতিলের পথ পরিহার করেছে।

তারা প্রতিটি পদক্ষেপে, জীবনের প্রতি মোড়ে মোড়ে ও প্রতিটি পথের চৌমাথায় তারা ন্যায় ও অন্যায় হতে ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারলো কেমন করে? তারপর এ পার্থক্য অনুযায়ী সঠিক পথের ওপর দৃঢ়তা এবং অন্যায় পথ থেকে দূরে থাকার শক্তি তারা কোথা থেকে পেলো?—এসব তারা লাভ করেছে তাদের রবের পক্ষ থেকে। তিনিই তাত্বিক পথনির্দেশনা দান এবং বাস্তব কাজের ক্ষমতা দান ও সুযোগ সৃষ্টির উৎস।

তাদের রব তাদেরকে পথনির্দেশনা এবং সুযোগ দান করেন কেন?—তাদের ঈমানের কারণে এ সুযোগ দেন।

ওপরে এই যে ফলাফলগুলো বর্ণিত হয়েছে এগুলো কোন্ ঈমান ও বিশ্বাসের ফল? এমন ঈমানের ফল নয় যার অর্থ হয় নিছক বিশ্বাস করা। বরং এমন ঈমানের ফল যা চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের পরিচালক শক্তি ও প্রাণসত্তায় পরিণত হয় এবং যার উদ্বুদ্ধকারী শক্তিতে শক্তিমান হয়ে কর্ম ও চরিত্রে নেকী ও সৎবৃত্তির প্রকাশ ঘটে। মানুষের পার্থিব ও জৈবিক জীবনেই দেখা যায় তার জীবন ধারণ, শারীরিক সুস্থতা, কর্মক্ষমতা ও জীবনের স্বাদ আহরণ করার জন্য তাকে বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হয়। কিন্তু শুধু খাদ্য খেয়ে নিলেই এসব গুণ ও ফল লাভ করা যায় না। বরং এমনভাবে খেতে হয় যার ফলে তা হজম হয়ে গিয়ে রক্ত সৃষ্টি করে এবং প্রতিটি শিরা উপ-শিরায় পৌঁছে শরীরের প্রতিটি অংশে এমন শক্তি সঞ্চার করে যার ফলে সে তার অংশের কাজ ঠিকমত করতে পারে। ঠিক একইভাবে নৈতিক জীবনে মানুষের সঠিক পথনির্দেশনা লাভ করা, সত্যকে দেখা, সত্য পথে চলা এবং সবশেষে কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করা সঠিক আকীদা-বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এমন ধরনের কোন আকীদা-বিশ্বাস এ ফল সৃষ্টি করতে পারে না, যা নিছক মুখে উচ্চারিত হয় অথবা মন ও মস্তিষ্কের কোন অংশে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে। বরং যে আকীদা-বিশ্বাস হৃদয়ের মর্মমূলে প্রবেশ করে তার সাথে একাকার হয়ে যায় এবং তারপর চিন্তা পদ্ধতি রুচি-প্রকৃতি ও মেজায-প্রবণতার অঙ্গীভূত হয়ে চরিত্র, কর্মকাণ্ড ও জীবনভংগীতে সুস্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। তাই এ ফল সৃষ্টিতে সক্ষম। যে ব্যক্তি খাদ্য খেয়ে তা যথাযথভাবে হজম করতে সক্ষম হয় তার জন্য যে পুরস্কার রাখা হয়েছে, যে ব্যক্তি আহার করেও অনাহারীর মতো থাকে আল্লাহর জৈব বিধান অনুযায়ী সে কখনো সেই পুরস্কারের অধিকারী হয় না। তাহলে যে ব্যক্তি ঈমান এনেও বেঈমানের মতো জীবন যাপন করে সে আল্লাহর নৈতিক বিধানে ঈমান আনয়নের পর সৎকর্মশীলের মত জীবন যাপনকারী যে পুরস্কার পায়, সে-ই পুরস্কার পাওয়ার আশা করতে পারে?

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑪ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑫

২ রুকূ'

আল্লাহ যদি[১৫] লোকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার ব্যাপারে অতটাই তাড়াহুড়া করতেন যতটা দুনিয়ার ভালো চাওয়ার ব্যাপারে তারা তাড়াহুড়া করে থাকে, তাহলে তাদের কাজ করার অবকাশ কবেই খতম করে দেয়া হতো (কিন্তু আমার নিয়ম এটা নয়)। তাই যারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করার আশা পোষণ করে না তাদেরকে আমি তাদের অবাধ্যতার মধ্যে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দেই। মানুষের অবস্থা হচ্ছে, যখন সে কোন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়, তখন সে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আমাকে ডাকে। কিন্তু যখন আমি তার বিপদ হটিয়ে দেই তখন সে এমনভাবে চলতে থাকে যেন সে কখনো নিজের কোন খারাপ সময়ে আমাকে ডাকেইনি। ঠিক তেমনিভাবে সীমা অতিক্রমকারীদের জন্য তাদের কার্যক্রমকে সুশোভন করে দেয়া হয়েছে।

১৪. এখানে চমকপ্রদ ভংগীতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার পরীক্ষাগৃহ থেকে সফলকাম হয়ে বের হয়ে সুখৈশ্বর্য ও সম্ভোগপূর্ণ জান্নাতে প্রবেশ করেই তারা বুভূক্ষের মত ভোগ্য সামগ্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না এবং চারদিক থেকে–

"হূর আনো, শরাব আনো,
গীটার বাজাও বাজাও পিয়ানো"

–এর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হবে না—যদিও জান্নাতের কথা শুনতেই কোন কোন বিকৃত বুদ্ধির অধিকারী লোকের মানসপটে এ ধরনের ছবিই ভেসে ওঠে। আসলে সৎ ঈমানদার ব্যক্তি দুনিয়ায় উন্নত চিন্তা ও উচ্চাংগের নৈতিক বৃত্তি অবলম্বন করা, নিজের আবেগ–অনুভূতিকে সংযত ও সুসজ্জিত করা, নিজের ইচ্ছা–অভিলাশকে পরিশুদ্ধ করা এবং নিজের চরিত্র ও কার্যকলাপকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করার মাধ্যমে নিজের মধ্যে যে ধরনের উৎকৃষ্টতম ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলবে ও মহত্তম গুণাবলী লালন করবে, দুনিয়ার পরিবেশ থেকে ভিন্নতর জান্নাতের অতি পবিত্র পরিবেশে সেই ব্যক্তিত্ব এবং সেই গুণাবলী

আরো বেশী উজ্জ্বল, প্রখর ও তেজোময় হয়ে ভেসে উঠবে. দুনিয়ায় আল্লাহর যে প্রশংসা ও পবিত্রতার কথা তারা বর্ণনা করতো সেখানে সেটিই হবে তাদের সবচেয়ে প্রিয় কাজ। দুনিয়ায় বাস করার সময় পরস্পরের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনার যে অনুভূতিকে তারা নিজেদের সামাজিক মনোভংগীর প্রাণ বায়ুতে পরিণত করেছিল সেখানকার সমাজ পরিবেশেও তাদের সেই অনুভূতিই সক্রিয় থাকবে।

১৫. ওপরের ভূমিকার পর এবার উপদেশ দেয়া ও বুঝাবার জন্য ভাষণ শুরু করা হচ্ছে। এ ভাষণটি পড়ার আগে এর পটভূমি সম্পর্কিত কিছু কথা সামনে রাখতে হবে।

এক ঃ এ ভাষণটি শুরু হওয়ার মাত্র কিছুকাল আগেই একটি দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন বিপদজনক দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটেছিল. সেই বিপদের আবর্তে পড়ে মক্কাবাসীদের নাভিশ্বাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে কুরাইশ গোত্রের অহংকারী লোকদের উদ্ধত মাথাগুলো অনেক নীচু হয়ে গিয়েছিল। তারা প্রার্থনা ও আহাজারি করতো. মূর্তি পূজায় ভাটা পড়ে গিয়েছিল. এক লা-শরীক আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গিয়েছিল। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে, শেষ পর্যন্ত আবু সুফিয়ান এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বালা-মুসিবত দূর করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করার আবেদন জানালো। কিন্তু যখন দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেলো, বৃষ্টি শুরু হলো এবং সমৃদ্ধির দিন এসে গেলো তখন আবার এ লোকদের সেই আগের বিদ্রোহাত্মক আচরণ, অসৎকর্ম ও সত্যবিরোধী তৎপরতা শুরু হয়ে গেলো। যাদের হৃদয় আল্লাহর দিকে ফিরতে শুরু করেছিল তারা আবার তাদের আগের ঘোর গাফলতিতে নিমজ্জিত হলো। (দেখুন ঃ আন নহল ১৩ আয়াত, আল মুমিনুন ৭৫-৭৭ আয়াত এবং আদ্ দুখান ১০-১৬ আয়াত)

দুই ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই তাদেরকে সত্য অমান্য করার কারণে ভয় দেখাতেন তখনই তারা জবাবে বলতো ঃ তুমি আল্লাহর যে আযাবের হুমকি দিচ্ছো তা আসছে না কেন? তার আসতে দেরি হচ্ছে কেন?

এরি জবাবে বলা হচ্ছে ঃ মানুষের প্রতি দয়া ও করুণা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আল্লাহ যতটা দ্রুতগামী হন, তাদের সাজা দেবার ও পাপ কাজ করার দরুন তাদেরকে পাকড়াও করার ব্যাপারে ততটা ত্বরিৎ গতি অবলম্বন করেন না. তোমরা চাও, তোমাদের দোয়া শুনে যেভাবে তিনি দুর্ভিক্ষের বিপদ দ্রুত অপসারণ করেছেন ঠিক তেমনি তোমাদের চ্যালেঞ্জ শুনে এবং তোমাদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা দেখে সংগে সংগেই আযাবও পাঠিয়ে দেবেন. কিন্তু এটা আল্লাহর নিয়ম নয়। মানুষ যতই অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করুক না কেন, এ অপরাধে তাদেরকে পাকড়াও করার আগে তিনি তাদেরকে সংশোধিত হবার যথেষ্ট সুযোগ দেন। একের পর এক সতর্ক বাণী পাঠান এবং রশি ঢিলে করে ছেড়ে দেন। অবশেষে যখন সুবিধা ও অবকাশ শেষ সীমায় উপনীত হয়, তখনই কর্মফলের নীতি কার্যকর হয়. এ হচ্ছে আল্লাহর পদ্ধতি। পক্ষান্তরে তোমরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছ সেটা হচ্ছে সংকীর্ণমনা মানুষদের পদ্ধতি। অর্থাৎ বিপদ এলে আল্লাহর কথা মনে পড়তে থাকে। তখন হা-হুতাশ ও কান্নাকাটির রোল পড়ে যায়। আবার যেই বিপদমুক্ত স্বস্তির দিন আসে অমনি সবকিছু ভুলে যাও। এ ধরনের অভ্যাস ও নীতির বদৌলতেই বিভিন্ন জাতির জন্য আল্লাহর আযাব অনিবার্য ও অবধারিত হয়ে ওঠে।

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۙ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

হে মানব জাতি! তোমাদের আগের জাতিদেরকে[১৬] (যারা তাদের নিজেদের যুগে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি—যখন তারা জুলুমের নীতি[১৭] অবলম্বন করলো এবং তাদের রসূলগণ তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিশানী নিয়ে এলেন, কিন্তু তারা আদৌ ঈমান আনলো না। এভাবে আমি অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধের প্রতিফল দিয়ে থাকি। এখন তাদের পরে আমি পৃথিবীতে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছি, তোমরা কেমন আচরণ করো তা দেখার জন্য।[১৮]

১৬. মূল আয়াতে "কারূন" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সাধারণভাবে আরবীতে এর অর্থ হয় কোন বিশেষ যুগের অধিবাসী বা প্রজন্ম; কিন্তু কুরআন মজীদে যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তাতে মনে হয় 'কারূন' শব্দের মাধ্যমে এমন জাতির কথা বুঝানো হয়েছে যারা নিজেদের যুগে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল এবং পুরোপুরি বা আংশিকভাবে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ ধরনের জাতির ধ্বংস নিশ্চিতভাবে এ অর্থ বহন করে না যে, শাস্তি হিসেবে তাদের সমগ্র জনশক্তিকেই ধ্বংস করে দেয়া হতো বরং তাদেরকে উন্নতি ও নেতৃত্বের আসন থেকে নামিয়ে দেয়া, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাওয়া, তাদের বৈশিষ্ট বিলুপ্ত হওয়া এবং তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য জাতির মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার মাধ্যমেও শাস্তি দেয়া হতো। মূলত এসবই ধ্বংসের এক একটি প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৭. সাধারণভাবে জুলুম বলতে যা বুঝায় এখানে সেই ধরনের কোন সংকীর্ণ অর্থ ব্যবহার করা হয়নি। বরং আল্লাহর বান্দা ও গোলাম হিসেবে যে সীমারেখা ও বিধি-নিষেধ মেনে চলা মানুষের কর্তব্য, সেই বিধি-নিষেধ ও সীমারেখা লংঘন করে সে যেসব গোনাহ করে এখানে সেগুলোর অর্থেই জুলুম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল বাকারার ৪৯ নম্বর টীকা)।

১৮. মনে রাখতে হবে, এখানে সম্বোধন করা হচ্ছে আরববাসীদেরকে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, আগের জাতিগুলোকে তাদের যুগে কাজ করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত জুলুম ও বিদ্রোহের নীতি অবলম্বন করেছিল এবং তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য যেসব নবী পাঠানো হয়েছিল তাঁদের কথা তারা মানেনি। তাই আমার পরীক্ষায় তারা

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার কথা শুনানো হয় তখন যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তারা বলে, "এটার পরিবর্তে অন্য কোন কুরআন আনো অথবা এর মধ্যে কিছু পরিবর্তন করো।"[১৯] হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, "নিজের পক্ষ থেকে এর মধ্যে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করা আমার কাজ নয়। আমি তো শুধুমাত্র আমার কাছে যে অহী পাঠানো হয়, তার অনুসারী। যদি আমি আমার রবের নাফরমানী করি তাহলে আমার একটি ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা হয়।[২০]

ব্যর্থ হয়েছে। এবং তাদেরকে ময়দান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়ছে। এখন হে আরববাসীরা! তোমাদের পালা এসেছে। তাদের জায়গায় তোমাদের কাজ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। তোমরা এখন পরীক্ষা গৃহে দাঁড়িয়ে আছো। তোমাদের পূর্ববর্তীরা ব্যর্থ হয়ে এখান থেকে বের হয়ে গেছে। তোমরা যদি তাদের মতো একই পরিণামের সম্মুখীন হতে না চাও তাহলে তোমাদের এই যে সুযোগ দেয়া হচ্ছে এ থেকে যথাযথভাবে লাভবান হও। অতীতের জাতিদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং যেসব ভুল তাদের ধ্বংসের কারণে পরিণত হয়েছিল সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করো না।

১৯. তাদের এ বক্তব্য প্রথমত এ ধারণার ভিত্তিতে উচ্চারিত হয়েছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু পেশ করছেন তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয় বরং তাঁর নিজের চিন্তার ফসল এবং শুধুমাত্র নিজের কথার গুরুত্ব বাড়াবার জন্য তিনি তাকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। দ্বিতীয়ত তারা বলতে চাচ্ছিল, তুমি এসব তাওহীদ, আখেরাত ও নৈতিক বিধি-নিষেধের আলোচনার অবতারণা করছো কেন? যদি জাতির পথ-নির্দেশনা তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এমন জিনিস পেশ করো যার ফলে জাতি লাভবান হয় এবং সে বৈষয়িক উন্নতি লাভ করতে পারে। তবুও যদি তুমি নিজের এ দাওয়াতকে একদম বদলাতে না চাও তাহলে কমপক্ষে এর মধ্যে এতটুকু নমনীয়তা সৃষ্টি করো যার ফলে আমাদের ও তোমার মধ্যে দরকষাকষির ভিত্তিতে সমঝোতা হতে পারে। আমরা তোমার কথা কিছু মেনে নেবো এবং তুমি আমাদের কথা কিছু মেনে নেবে। তোমার তাওহীদের মধ্যে আমাদের শিরকের জন্য কিছু জায়গা দিতে হবে তোমার আল্লাহ প্রীতির মধ্যে আমাদের দুনিয়া প্রীতির সহাবস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তোমার পরকাল

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۫ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۶﴾ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿۱۷﴾

আর বলো, যদি এটিই হতো আল্লাহর ইচ্ছা তাহলে আমি এ কুরআন তোমাদের কখনো শুনাতাম না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এর খবরও দিতেন না। আমি তো এর আগে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছি, তবুও কি তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনা করে কাজ করতে পার না?[২১] তারপর যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বানিয়ে তাকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করে অথবা আল্লাহর যথার্থ আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?[২২] নিসন্দেহে, অপরাধী কোনদিন সফলকাম হতে পারে না।[২৩]

বিশ্বাসের মধ্যে আমাদের এ ধরনের বিশ্বাসের কিছু অবকাশ রাখতে হবে যে, দুনিয়ায় আমরা যা চাই তা করতে থাকবো কিন্তু আখেরাতে কোন না কোনভাবে অবশ্যি আমরা মুক্তি পেয়ে যাবো। তাছাড়া তুমি যে কঠোরতম ও অনমনীয় নৈতিক মূলনীতিগুলোর প্রচার করে থাক, তা আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। এর মধ্যে আমাদের সংকীর্ণ গোত্রস্বার্থ, রসম-রেওয়াজ, ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থ এবং আমাদের প্রবৃত্তির আশা-আকংখার জন্যও কিছুটা অবকাশ থাকা উচিত। আমাদের ও তোমার মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ইসলামের দবীসমূহের একটি ন্যায়সংগত পরিসর স্থিরিকৃত হয়ে যাওয়াটা কি বাঞ্ছনীয় নয়? সেই পরিসরে আমরা আল্লাহর হক আদায় করে দেবো। এরপর আমাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতে হবে। আমরা যেভাবে চাইবো বৈষয়িক কাজ কারবার চালিয়ে যেতে থাকবো। কিন্তু তুমি তো সমগ্র জীবন ও সমস্ত কাজ-কারবারকে তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাস এবং শরীয়াতের বিধানের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন করার সর্বনাশা নীতি গ্রহণ করেছো।

২০. এটি হচ্ছে ওপরের দু'টি কথার জবাব। এখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, আমি এ কিতাবের রচয়িতা নই বরং অহীর মাধ্যমে এটি আমার কাছে এসেছে এবং এর মধ্যে কোন রকম রদ বদলের অধিকারও আমার নেই। আর তাছাড়া এ ব্যাপারে কোন প্রকার সমঝোতার সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই। যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে এ সমগ্র দীনকে হুবহু গ্রহণ করতে হবে, নয়তো পুরোপুরি রদ করে দিতে হবে।

২১. কুরআনের বাণীগুলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তৈরী করে আল্লাহর বলে চালিয়ে দিচ্ছেন, এ মর্মে তারা যে অপবাদ রটাচ্ছিল এটি তার একটি দাঁতভাংগা জবাব ও তার প্রতিবাদে একটি অকাট্য যুক্তি। এই সাথে মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নিজে এ কিতাবের রচয়িতা নন বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে এটি তাঁর ওপর নাযিল হচ্ছে, তাঁর এ দাবীর সপক্ষেও এটি একটি জোরালো

যুক্তি। অন্য যুক্তি–প্রমাণগুলো তবুওতো তুলনামূলকভাবে দূরবর্তী বিষয় ছিল কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন তো তাদের সামনের জিনিস ছিল। নবুওয়াত লাভের আগে পুরো চল্লিশটি বছর তিনি তাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি তাদের শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের চোখের সামনে তাঁর শিশুকাল অতিক্রান্ত হয়। সেখানেই বড় হন। যৌবনে পদার্পণ করেন তারপর প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেন। থাকা–খাওয়া, ওঠাবসা, লেনদেন, বিয়ে শাদী ইত্যাদি সব ধরনের সামাজিক সম্পর্ক তাদের সাথেই ছিল এবং তাঁর জীবনের কোন দিক তাদের কাছে গোপন ছিল না। এমন ধরনের সুপরিচিত ও চোখে দেখা জিনিসের চাইতে ভালো সাক্ষ আর কি হতে পারে?

তাঁর এ জীবনধারার মধ্যে দু'টি বিষয় একেবারেই সুস্পষ্ট ছিল। মক্কার প্রত্যেকটি লোকই তা জানতো।

এক, নবুওয়াত লাভ করার আগে তাঁর জীবনের পুরো চল্লিশটি বছরে তিনি এমন কোন শিক্ষা, সাহচর্য ও প্রশিক্ষণ লাভ করেননি এবং তা থেকে এমন তথ্যাদি সংগ্রহ করেননি যার ফলে একদিন হঠাৎ নবুওয়াতের দাবী করার সাথে সাথেই তার কণ্ঠ থেকে এ তথ্যাবলীর ঝরণাধারা নিঃসৃত হতে আরম্ভ করেছে। কুরআনের এসব সূরায় এখন একের পর এক যেসব বিষয় আলোচিত হচ্ছিল এবং যেসব চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটছিল এর আগে কখনো তাঁকে এ ধরনের সমস্যার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে, এ বিষয়াবলীর ওপর আলোচনা করতে এবং এ ধরনের অভিমত প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। এমনকি এ পুরো চল্লিশ বছরের মধ্যে কখনো তাঁর কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং কোন নিকটতম আত্মীয়ও তাঁর কথাবার্তা ও আচার–আচরণে এমন কোন জিনিস অনুভব করেনি যাকে তিনি হঠাৎ চল্লিশ বছরে পদার্পণ করে যে মহান দাওয়াতের সূচনা করেন তার ভূমিকা বা পূর্বাভাস বলা যেতে পারে। কুরআন যে তার নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত নয় বরং বাইর থেকে তাঁর মধ্যে আগত এটাই ছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কারণ জীবনের কোন পর্যায়েও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তার জন্য এমন কোন জিনিস পেশ করতে পারে না যার উন্নতি ও বিকাশের সুস্পষ্ট আলামত তার পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোয় পাওয়া যায় না। এ কারণে মক্কার কিছু চতুর লোক যখন নিজেরাই কুরআনকে রসূলের মস্তিষ্কপ্রসূত গণ্য করাকে একেবারেই একটি বাজে ও ভূয়া দোষারোপ বলে উপলব্ধি করলো তখন শেষ পর্যন্ত তারা বলতে শুরু করলো, অন্য কেউ মুহাম্মাদকে একথা শিখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এ দ্বিতীয় কথাটি প্রথম কথাটির চাইতেও বেশী বাজে ও ভূয়া ছিল। কারণ শুধু মক্কায়ই নয়, সারা আরব দেশেও এমন একজন লোক ছিল না যার দিকে অংগুলি নির্দেশ করে বলা যেতে পারতো যে, ইনিই এ বাণীর রচয়িতা বা রচয়িতা হতে পারেন। এহেন যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তি কোন সমাজে আত্মগোপন করে থাকার মত নয়।

দ্বিতীয় যে কথাটি তাঁর পূর্ববর্তী জীবনে একদম সুস্পষ্ট ছিল সেটি ছিল এই যে, মিথ্যা, প্রতারণা, জালিয়াতী, ধোঁকা, শঠতা, ছলনা এবং এ ধরনের অন্যান্য অসৎগুণাবলীর কোন সমান্যতম গন্ধও তাঁর চরিত্রে পাওয়া যেতো না। গোটা আরব সমাজে এমন এক ব্যক্তিও ছিল না যে একথা বলতে পারতো যে, এ চল্লিশ বছরের সহাবস্থানের সময় তাঁর ব্যাপারে এমন কোন আচরণের অভিজ্ঞতা তার হয়েছে। পক্ষান্তরে তাঁর সাথে যাদেরই যোগাযোগ হয়েছে তারাই তাঁকে একজন অত্যন্ত সাচ্চা, নিষ্কলংক ও বিশ্বস্ত (আমানতদার) ব্যক্তি

হিসেবেই জেনেছে। নবুওয়াত লাভের মাত্র পাঁচ বছর আগের কথা। কাবা পুনর্নির্মাণের সময় কুরাইশদের বিভিন্ন পরিবার হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) সংস্থাপনের প্রশ্নে বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে স্থিরিকৃত হয়েছিল, পরদিন সকালে সবার আগে যে ব্যক্তি কাবাঘরে প্রবেশ করবে তাকেই শালিস মানা হবে। পরদিন সেখানে সবার আগে প্রবেশ করেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁকে দেখেই সবাই সমস্বরে বলে ওঠে : هذا الامين، رضينا، هذا محمد "এ সেই সাচ্চা ও সৎ ব্যক্তি। আমরা এর ফায়সালায় রাযী। এতো মুহাম্মাদ।" এভাবে তাঁকে নবী হিসেবে নিযুক্ত করার আগেই আল্লাহ সমগ্র কুরাইশ গোত্র থেকে তাদের ভরা মজলিসে তাঁর "আমীন' হবার সাক্ষী নিয়েছিলেন। এখন যে ব্যক্তি তার সারা জীবন কোন ক্ষুদ্রতম ব্যাপারেও মিথ্যা, প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নেননি তিনি অকস্মাত এতবড় মিথ্যা, জালিয়াতী ও প্রতারণার জাল বিস্তার করে এগিয়ে আসবেন কেন? তিনি নিজের মনে মনে কিছু বাণী রচনা করে নেবেন এবং সর্বাত্মক বলিষ্ঠতা সহকারে চ্যালেঞ্জ দিয়ে সেগুলোকে আল্লাহর বাণী বলে প্রচার করবেন, এ ধরনের কোন সন্দেহ পোষণ করার অবকাশই বা সেখানে কোথায়?

এ কারণে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, তাদের এ নিরর্থক দোষারোপের জবাবে তাদেরকে বলো : হে আল্লাহর বান্দারা। নিজেদের বিবেক বুদ্ধিকে কিছু কাজে লাগাও। আমি তো বহিরাগত কোন অপরিচিত আগন্তুক নই। তোমাদের মাঝে জীবনের একটি বিরাট সময় আমি অতিবাহিত করেছি। আমার অতীত জীবনের কার্যাবলী দেখার পর তোমরা কেমন করে আমার কাছ থেকে আশা করতে পারো যে, আমি আল্লাহর হুকুম ও তাঁর শিক্ষা ছাড়াই এ কুরআন তোমাদের সামনে পেশ করতে পারি? (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা কাসাস ১০৯ টীকা)।

২২. অর্থাৎ যদি এ আয়াতগুলো আল্লাহর না হয়ে থাকে এবং আমি নিজে এগুলো রচনা করে আল্লাহর আয়াত বলে পেশ করে থাকি, তাহলে আমার চাইতে বড় জালেম আর কেউ নেই। আর যদি এগুলো সত্যিই আল্লাহর আয়াত হয়ে থাকে এবং তোমরা এগুলো অস্বীকার করে থাকো তাহলে তোমাদের চাইতে বড় জালেম আর কেউ নেই।

২৩. কোন কোন অজ্ঞ লোক "সফলকাম" বলতে দীর্ঘজীবন বা বৈষয়িক সমৃদ্ধি অথবা পার্থিব উন্নতি অর্থ গ্রহণ করেন। তারপর এ আয়াত থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান যে, নবুওয়াতের দাবী করার পর যে ব্যক্তি বেঁচে থাকে, দুনিয়ায় উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে অথবা তার দাওয়াত সম্প্রসারিত হতে থাকে, তাকে সত্য নবী বলে মেনে নেয়া উচিত। কারণ সে সফলকাম হয়েছে। যদি সে সত্য নবী না হতো তাহলে মিথ্যা দাবী করার সাথে সাথেই তাকে হত্যা করা হতো অথবা অনাহারে মেরে ফেলা হতো এবং দুনিয়ায় তার কথা ছড়াতেই পারতো না। কিন্তু এ ধরনের নির্বুদ্ধিতাসুলভ যুক্তি একমাত্র সেই ব্যক্তিই প্রদর্শন করতে পারে, যে কুরআনী পরিভাষা "সফলকাম"–এর অর্থ জানে না এবং অবকাশ দানের বিধান সম্পর্কেও জ্ঞাত নয়। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহ অপরাধীদের জন্য এ বিধান নির্ধারিত করেছেন। এ সংগে এ বর্ণনার মধ্যে এ বাক্যটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তাও বুঝে না।

প্রথমত "অপরাধী সফলকাম হতে পারে না" একথাটি এ আলোচনার ক্ষেত্রে এভাবে বলা হয়নি যে, এটিকে কারোর নবুওয়াতের দাবী যাচাই করার মাপকাঠিতে পরিণত করা হবে এবং সাধারণ জনসমাজ যাচাই পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌছবে যে, যে নবুওয়াতের দাবীদার "সফলকাম" হচ্ছে তার দাবী মেনে নেয়া হবে এবং যে "সফল কাম" হচ্ছে না। তার দাবী অস্বীকার করা হবে। বরং এখানে একথাটি এ অর্থে বলা হয়েছে যে, "আমি নিশ্চয়তা সহকারে জানি অপরাধিরা সফলকাম হতে পারে না। তাই আমি নিজে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করার অপরাধ করতে পারি না। তবে তোমাদের ব্যাপারে আমি নিশ্চিতভাবে জানি, তোমরা সত্য নবীকে অস্বীকার করার অপরাধ করছো। কাজেই তোমরা সফলকাম হবে না।

তাছাড়া সফলকাম শব্দটিও কুরআনে বৈষয়িক সফলতার সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং এর অর্থ এমন ধরনের চিরন্তন সফলতা যা কোন দিন ব্যর্থতা ও ক্ষতিতে পর্যবসিত হবে না। পার্থিব জীবনের এ প্রাথমিক পর্যায়ে এর মধ্যে সাফল্যের কোন দিক থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। হতে পারে একজন গোমরাহীর আহবায়ক দুনিয়ায় আরাম–আয়েশে জীবন যাপন করছে। তার জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। তার গোমরাহী দুনিয়ার বুকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু কুরআনের পরিভাষায় এটা সাফল্য নয় বরং দ্ব্যর্থহীন ক্ষতি ও ব্যর্থতা। আবার এও হতে পারে, একজন সত্যের আহবায়ক দুনিয়ায় কঠিন বিপদের মুখোমুখি হচ্ছে। দুঃখ–কষ্টের ভয়াবহতা তার স্নায়ুতন্ত্রকে অসাড় করে দেবার ফলে অথবা জালেমদের নির্যাতনের শিকার হয়ে সে দুনিয়ার বুক থেকে দ্রুত বিদায় নিচ্ছে। এবং তার আহবানে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। কিন্তু কুরআনের ভাষায় এটা ক্ষতি ও ব্যর্থতা নয় বরং এটাই সফলতা।

এ ছাড়া কুরআনে বারবার একথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ অপরাধীদেরকে দ্রুত পাকড়াও করেন না। বরং তাদেরকে সামলে নেবার জন্য যথেষ্ট অবকাশ দেন। এ অবকাশের সুযোগকে যদি তারা অবৈধভাবে ব্যবহার করে আরো বেশী অপকর্ম করতে থাকে তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের রশি ঢিলে করে দেয়া হয় এবং অনেক সময় তাদের ওপর অনুগ্রহ ধারা বর্ষিত হয়। এর ফলে তাদের অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে থাকা যাবতীয় অসৎবৃত্তি বাইরে বেরিয়ে আসার সুযোগ পায়। এভাবে নিজেদের অসৎগুণাবলীর কারণে প্রকৃতপক্ষে তাদের যে ধরনের শাস্তি পাওয়া উচিত নিজেদের কাজের ভিত্তিতে তারা ঠিক তেমনি শাস্তির উপযুক্ত হয়। কাজেই কোন মিথ্যা দাবীদারের রশি দীর্ঘ হতে এবং তার ওপর পার্থিব সাফল্যের বারিধারা বর্ষিত হতে থাকলে তার এ অবস্থাকে তার সত্য ও সঠিক পথাশ্রয়ী হবার প্রমাণ মনে করা মারাত্মক ভুল হবে। কাজেই আল্লাহর অবকাশ ও ক্রমান্বয়ে ঢিল দেবার নীতি যেমন সমস্ত অপরাধীদের জন্য সাধারণভাবে কার্যকর থাকে তেমনি কার্যকর থাকে মিথ্যা দাবীদারদের জন্যও। এ নীতি ও আইন থেকে তাদের ব্যতিক্রম ঘটার কোন প্রমাণ নেই। তারপর শয়তানকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত যে অবকাশ দিয়েছেন সেখানেও এ ব্যতিক্রমের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। সেখানে একথা বলা হয়নি যে, তোমার অন্য সমস্ত জালিয়াতীকে অবাধে চলার সুযোগ দেয়া হবে কিন্তু যদি তুমি নিজের পক্ষ থেকে কোন নবী দাঁড় করিয়ে দাও তাহলে এ ধরনের জালিয়াতীকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে না।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ
شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا
فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ
إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ
فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا ۚ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾

এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত করছে তারা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, "তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছো যার অস্তিত্বের কথা তিনি আকাশেও জানেন না এবং যমিনেও না।"[২৪] তারা যে শিরক্ করে তা থেকে তিনি পাক-পবিত্র এবং তার উর্ধে।

শুরুতে সমস্ত মানুষ ছিল একই জাতি। পরবর্তীকালে তারা বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস ও মত-পথ তৈরী করে নেয়।[২৫] আর যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে আগেভাগেই একটি কথা স্থিরীকৃত না হতো তাহলো যে বিষয়ে তারা পরস্পর মতবিরোধ করছে তার মীমাংসা হয়ে যেতো।[২৬]

আর এই যে তারা বলে যে, এ নবীর প্রতি তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয়নি কেন?[২৭] এর জবাবে তুমি তাদেরকে বলে দাও, "গায়েবের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ, ঠিক আছে, তোমরা অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করবো।"[২৮]

কোন ব্যক্তি আমাদের এ বক্তব্যের জওয়াবে সূরা আল হাক্কার ৪৪ থেকে ৪৭ পর্যন্ত আয়াত ক'টি পেশ করতে পারেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا
مِنْهُ الْوَتِينَ ۝

"যদি মুহাম্মাদ নিজে কোন মনগড়া কথা আমার নামে বলতো তাহলে আমি তার হাত ধরে ফেলতাম এবং তার হৃদপিণ্ডের রগ কেটে দিতাম।"

কিন্তু এ আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তিকে যথার্থই আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী নিযুক্ত করা হয়েছে সে যদি মিথ্যা কথা বানিয়ে অহী হিসেবে পেশ করে তাহলে সংগে সংগেই তাকে পাকড়াও করা হবে। এ থেকে যে স্বকথিত নবীকে পাকড়াও করা হচ্ছে না সে নিশ্চয়ই সাচ্চা নবী, এ সিদ্ধান্ত টানা একটি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহর অবকাশ দান ও ঢিল দেয়ার আইনের ব্যাপারে এ আয়াত থেকে যে ব্যতিক্রম প্রমাণ হচ্ছে তা কেবল সাচ্চা নবীর জন্য। নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদারও এ ব্যতিক্রমের আওতাভুক্ত—এ সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন সুযোগই এখানে নেই। সবাই জানে, সরকারী কর্মচারীদের জন্য সরকার যে আইন তৈরী করেছে তা কেবল তাদের ওপরই প্রযোজ্য হবে যারা যথার্থই সরকারী কর্মচারী। আর যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেদেরকে সরকারী কর্মচারী হিসেবে পেশ করে তাদের ওপর সরকারী কর্মচারী আইন কার্যকর হবে না। বরং ফৌজদারী আইন অনুযায়ী সাধারণ বদমায়েশ ও অপরাধীদের সাথে যে ব্যবহার করা হয় তাদের সাথেও সেই একই ব্যবহার করা হবে। এ ছাড়াও সূরা আল হাক্কার এ আয়াতে যা কিছু বলা হয়েছে সেখানেও নবী যাচাই করার কোন মানদণ্ড বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। সেখানে এ উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলা হয়নি যে, কোন অদৃশ্য হাত এসে যদি অকস্মাত নবুওয়াতের দাবীদারের হৃদপিণ্ডের রগ কেটে দেয় তাহলে মনে করবে সে মিথ্যা নবী অন্যথায় তাকে সাচ্চা বলে মেনে নেবে। নবীর সাচ্চা বা মিথ্যা হবার ব্যাপারটি যদি তার চরিত্র, কর্মকাণ্ড এবং তার উপস্থাপিত দাওয়াতের মাধ্যমে যাচাই করা সম্ভব না হয় তবেই এ ধরনের অযৌক্তিক মানদণ্ড উপস্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

২৪. কোন জিনিসের আল্লাহর জ্ঞানের অন্তরভুক্ত না হওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে, সেটির আদতে কোন অস্তিত্বই নেই। কারণ, যা কিছুর অস্তিত্ব আছে সবই আল্লাহর জ্ঞানের অন্তরভুক্ত। কাজেই আল্লাহ তো জানেন না আকাশে ও পৃথিবীতে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন সুপারিশকারী আছে, এটি আসলে সুপারিশকারীদের অস্তিত্বহীনতার ব্যাপারে একটি কৌতুকপ্রদ বর্ণনা পদ্ধতি। অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে যখন কোন সুপারিশকারী আছে বলে আল্লাহর জানা নেই এখন তোমরা কোন্ সুপারিশকারীদের কথা বলছো?

২৫. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আল–বাকারার ২৩০ এবং সূরা আল আনআমের ২৪ টীকা।

২৬. অর্থাৎ মহান আল্লাহ যদি পূর্বাহ্নেই ফায়সালা না করে নিতেন যে, প্রকৃত সত্যকে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না করে তাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেক ও স্বতস্ফূর্ত অনুভূতিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন এবং যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ভুল পথে যেতে চাইবে তাকে সে পথে যাবার ও চলার সুযোগ দেয়া হবে, তাহলে প্রকৃত সত্যকে আজই প্রকাশ ও উন্মুক্ত করে দিয়ে সমস্ত মতবিরোধের অবসান ঘটানো যেতে পারতো।

একটি মারাত্মক বিভ্রান্তি দূর করার জন্য এখানে একথাটি বলা হয়েছে। সাধারণভাবে আজো লোকেরা এ বিভ্রান্তিজনিত জটিল সমস্যায় ভুগছে। কুরআন নাযিল হবার সময়ও এ সমস্যাটি তাদের সামনে ছিল। সমস্যাটি হচ্ছে, দুনিয়ায় বহু ধর্ম রয়েছে এবং প্রত্যেক ধর্মের

وَإِذَآ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِىٓ
ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾
هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ع
وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ
ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

লোকদের অবস্থা হচ্ছে, বিপদের পরে যখন আমি তাদের রহমতের স্বাদ ভোগ করতে দেই তখনই তারা আমার নিদর্শনের ব্যাপারে ধড়িবাজী শুরু করে দেয়।[২৯] তাদেরকে বলো, "আল্লাহ তাঁর চালাকিতে তোমাদের চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন। তাঁর ফেরেশতারা তোমাদের সমস্ত চালাকি লিখে রাখছে।"[৩০] তিনিই তোমাদের জলে–স্থলে চলাচলের ব্যবস্থা করেন। কাজেই যখন তোমরা নৌকায় চড়ে অনুকূল বাতাসে আনন্দে সফর করতে থাকো, তারপর অকস্মাত বিরুদ্ধ বাতাস প্রবল হয়ে ওঠে, চারদিক থেকে ঢেউয়ের আঘাত লাগতে থাকে এবং আরোহীরা মনে করতে থাকে তারা তরংগ বেষ্টিত হয়ে গেছে তখন সবাই নিজের আনুগত্যকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁর কাছে দোয়া করতে থাকে এবং বলতে থাকে, "যদি তুমি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো তাহলে আমরা শোকরগুজার বান্দা হয়ে যাবো।"[৩১]

লোকেরা তাদের নিজেদের ধর্মকে সত্য মনে করে। এ অবস্থায় এগুলোর মধ্যে কোন্ ধর্মটি সত্য এবং কোন্‌টি মিথ্যা তা কেমন করে যাচাই করা যাবে? এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এ ধর্ম বিরোধ ও মতপার্থক্য আসলে পরবর্তীকালের সৃষ্টি। শুরুতে সমগ্র মানবগোষ্ঠী একই ধর্মের আওতাভুক্ত ছিল। সেটিই ছিল সত্য ধর্ম। তারপর এ সত্যের ব্যাপারে মতবিরোধ করে লোকেরা বিভিন্ন আকীদা–বিশ্বাস ও ধর্ম গড়ে যেতে থাকে। এখন যদি ধর্ম–বৈষম্য ও ধর্ম–বিরোধ দূর করার জন্য তোমাদের মতে বুদ্ধি ও চেতনার সঠিক ব্যবহারের পরিবর্তে শুধুমাত্র আল্লাহর নিজেকে সামনে এসে সত্যকে উন্মুক্ত ও আবরণমুক্ত করে তুলে ধরতে হয়, তাহলে বর্তমান পার্থিব জীবনে তা সম্ভব নয়। দুনিয়ার এ জীবনটাতো

পরীক্ষার জন্য। এখানে সত্যকে না দেখে বুদ্ধি ও বিবেচনার সাহায্যে তাকে চিনে নেয়ার পরীক্ষা হয়ে থাকে।

২৭. অর্থাৎ এ ব্যাপারে নিদর্শন যে, তিনি যথার্থই সত্য নবী এবং যা কিছু তিনি পেশ করছেন তা পুরোপুরি ঠিক। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে। সেটি হচ্ছে, নিদর্শন পেশ করার দাবী তারা এ জন্য করেনি যে, তারা সাচ্চা দিলে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করতে এবং তার দাবী অনুযায়ী নিজেদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, সমাজ ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক জীবন তথা নিজেদের সমগ্র জীবন ঢেলে সাজাতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু নবীর সমর্থনে এ পর্যন্ত তারা এমন কোন নিদর্শন দেখেনি যা দেখে তাঁর নবুওয়াতের প্রতি তাদের বিশ্বাস জন্মাতে পারে। কেবলমাত্র এ জন্যই তারা হাত পা গুটিয়ে বসেছিল। আসলে নিশানীর এ দাবী শুধুমাত্র ঈমান না আনার জন্য একটি বাহানা হিসেবে পেশ করা হচ্ছিল। তাদেরকে যাই কিছু দেখানো হতো তা দেখার পরও তারা একথাই বলতো, আমাদের কোন নিশানীই দেখানো হয়নি। কারণ তারা ঈমান আনতে চাচ্ছিল না। দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক কাঠামো অবলম্বন করে প্রবৃত্তির খায়েশ ও পছন্দ অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা কাজ করার এবং যে জিনিসের মধ্যে স্বাদ বা লাভ অনুভব করে তার পেছনে দৌড়াবার যে স্বাধীনতা তাদের ছিল তা পরিত্যাগ করে তারা এমন কোন অদৃশ্য সত্য (তাওহীদ ও আখেরাত) মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না যা মেনে নেবার পর তাদের সমগ্র জীবন ব্যবস্থাকে স্থায়ী ও স্বতন্ত্র নৈতিক বিধানের বাঁধনে বেঁধে ফেলতে হতো।

২৮. আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেছেন তা আমি পেশ করে দিয়েছি। আর যা তিনি নাযিল করেননি তা আমার ও তোমাদের জন্য "অদৃশ্য" এর ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইখতিয়ার নেই। তিনি চাইলে তা নাযিল করতে পারেন আবার চাইলে নাও করতে পারেন। এখন আল্লাহ যা কিছু নাযিল করেননি তা আগে তিনি নাযিল করুন—একথার ওপর যদি তোমাদের ঈমান আনার বিষয়টি আটকে থাকে তাহলে তোমরা তার অপেক্ষায় বসে থাকো। আমিও দেখবো, তোমাদের এ জিদ পুরো করা হয় কিনা।

২৯. ১১–১২ আয়াতে যে দুর্ভিক্ষের কথা বলা হয়েছে এখানে আবার তারই প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এর মানে, তোমরা কোন্ মুখে নিদর্শন চাইছো? এ কিছুদিন আগে তোমরা একটি দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছিলে। তাতে তোমরা নিজেদের মাবুদদের থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলে। তোমরা এ মাবুদদেরকে আল্লাহর কাছে নিজেদের সুপারিশকারী বানিয়ে রেখেছিলে। এদের সম্পর্কে তোমরা বলে বেড়াতে ঃ "অমুক বেদী-মূলে অর্ঘ পেশ করা মাত্রই ফল পাওয়া যায়" এবং "অমুক দরগায় সিন্নি দিলে নির্ঘাত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়।" এবার তোমরা দেখে নিয়েছো, এসব তথাকথিত উপাস্য ও মাবুদদের হাতে কিছুই নেই। একমাত্র আল্লাহই সমস্ত ক্ষমতার মালিক। এ জন্যই তো তোমরা সর্বশেষে একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যে শিক্ষা দিচ্ছেন তার সত্যতার প্রতি তোমাদের মনে বিশ্বাস জন্মাতো, এ নিদর্শনটিই কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না? কিন্তু এ নিদর্শন দেখে তোমরা কি করেছো? যখনই দুর্ভিক্ষের অবসান হয়েছে এবং আল্লাহর রহমতের বারি সিঞ্চনে তোমাদের বিপদ দূরীভূত হয়েছে তখনই তোমরা এ বিপদ আসার ও দূরীভূত হবার হাজারটা ব্যাখ্যা (চালাকি) করতে শুরু করেছো। এভাবে তোমরা

فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ
إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَـٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ
فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ
أَنزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ
وَٱلْأَنْعَـٰمُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ
أَنَّهُمْ قَـٰدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَىٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَـٰهَا حَصِيدًا
كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে বিপদমুক্ত করেন তখন তারাই সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীতে বিদ্রোহ করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের এ বিদ্রোহ উলটা তোমাদের বিরুদ্ধেই চলে যাচ্ছে। দুনিয়ার কয়েকদিনের আরাম আয়েশ (ভোগ করে নাও), তারপর আমার দিকেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে। তোমরা কি কাজে লিপ্ত ছিলে তা তখন তোমাদের আমি জানিয়ে দেবো। দুনিয়ার এ জীবন (যার নেশায় মাতাল হয়ে তোমরা আমার নিশানীগুলোর প্রতি উদাশীন হয়ে যাচ্ছো) এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেমন আকাশ থেকে আমি পানি বর্ষণ করলাম, তার ফলে যমীনের উৎপাদন, যা মানুষ ও জীব–জন্তু খায়, ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে গেল। তারপর ঠিক এমন সময় যখন যমীন তার ভরা বসন্তে পৌঁছে গেল এবং ক্ষেতগুলো শস্যশ্যামল হয়ে উঠলো। আর তার মালিকরা মনে করলো এবার তারা এগুলো ভোগ করতে সক্ষম হবে, এমন সময় অকস্মাত রাতে বা দিনে আমার হুকুম এসে গেলো। আমি তাকে এমনভাবে ধ্বংস করলাম যেন কাল সেখানে কিছুই ছিল না। এভাবে আমি বিশদভাবে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করে থাকি তাদের জন্য যারা চিন্তা–ভাবনা করে।

তাওহীদকে মেনে নেয়া থেকে নিষ্কৃতি পেতে এবং নিজেদের শিরকের ওপর অবিচল থাকতে চাও। এখন যারা নিজেদের বিবেককে এভাবে নষ্ট করে দিয়েছে তাদেরকে কোন্ ধরনের নিদর্শন দেখানো হবে এবং তা দেখানোর ফায়দা বা কি হবে?

৩০. আল্লাহর চালাকি মানে হচ্ছে, যদি তোমরা সত্যকে না মেনে নাও এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের মনোভাবের পরিবর্তন না করো তাহলে তিনি তোমাদের এ বিদ্রোহাত্মক

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ؕ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ ۭ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٧﴾

(তোমরা এ অস্থায়ী জীবনের প্রতারণা জালে আবদ্ধ হচ্ছো) আর আল্লাহ তোমাদের শান্তির ভুবনের দিকে আহবান জানাচ্ছেন।[৩২] (হেদায়াত তাঁর ইখতিয়ারভুক্ত) যাকে তিনি চান সোজা পথ দেখান। যারা কল্যাণের পথ অবলম্বন করেছে তাদের জন্য আছে কল্যাণ এবং আরো বেশী।[৩৩] কলংক কালিমা বা লাঞ্ছনা তাদের চেহারাকে আবৃত করবে না। তারা জান্নাতের হকদার, সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। আর যারা খারাপ কাজ করেছে, তারা তাদের খারাপ কাজ অনুযায়ীই প্রতিফল পাবে।[৩৪] লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। আল্লাহর হাত থেকে তাদেরকে বাঁচাবার কেউ থাকবে না। তাদের চেহারা যেন আঁধার রাতের কালো আবরণে আচ্ছাদিত হবে।[৩৫] তারা দোজখের হকদার, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

নীতি অবলম্বন করে চলার সুযোগ করে দেবেন। তোমরা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তিনি নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের রিযিক ও অনুগ্রহ দান করতে থাকবেন। এর ফলে তোমাদের জীবন সামগ্রী এভাবেই তোমাদের মোহান্ধ করে রাখবে। এ মোহান্ধতার মধ্যে তোমরা যা কিছু করবে আল্লাহর ফেরেশতারা নীরবে বসে বসে তা লিখে নিতে থাকবেন। এভাবে এক সময় অকস্মাত মৃত্যুর পয়গাম এসে যাবে। তখন নিজেদের কৃতকর্মের হিসাব দেবার জন্য তোমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হবে।

৩১. প্রত্যেক মানুষের অন্তরে রয়েছে তাওহীদের সত্যতার নিশানী। যতদিন উপায়-উপকরণ অনুকূল থাকে ততদিন মানুষ আল্লাহকে ভুলে পার্থিব জীবন নিয়ে অহংকারে মত্ত হয়ে থাকে। আর উপায় উপকরণ প্রতিকূল হয়ে গেলে এবং এ সংগে যেসব সহায়ের ভিত্তিতে সে পৃথিবীতে বেঁচেছিল সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেলে তারপর কট্টর মুশরিক ও নাস্তিকের মনেও এ সাক্ষ ধ্বনিত হতে থাকে যে, কার্যকারণের এ সমগ্র জগতের ওপর কোন আল্লাহর কর্তৃত্ব পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তিনি একক আল্লাহ এবং তিনি শক্তিশালী ও বিজয়ী (আনআম ২৯ টীকা দেখুন)।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾

যেদিন আমি তাদের সবাইকে এক সাথে (আমার আদালতে) একত্র করবো তারপর যারা শিরক করেছে তাদেরকে বলবো, থেমে যাও তোমারাও এবং তোমাদের তৈরী করা শরীকরাও। তারপর আমি তাদের মাঝখান থেকে অপরিচিতির আবরণ সরিয়ে নেবো।[৩৬] তখন তারা যাদেরকে শরীক করেছিল তারা বলবে, "তোমরা তো আমাদের ইবাদাত করতে না। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সাক্ষ যথেষ্ট, (তোমরা আমাদের ইবাদাত করতে থাকলেও) আমরা তোমাদের এ ইবাদাত সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।"[৩৭] সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের স্বাদ নেবে। সবাইকে তার প্রকৃত মালিক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তারা যে সমস্ত মিথ্যা তৈরী করে রেখেছিল তা সব উধাও হয়ে যাবে।

৩২. অর্থাৎ দুনিয়ায় জীবন যাপন করার এমন পদ্ধতির দিকে তোমাদের আহবান জানানো, যা আখেরাতের জীবনে তোমাদের দারুস সালাম বা শান্তির ভবনের অধিকারী করে। দারুস সালাম বলতে জান্নাত বুঝানো হয়েছে এবং এর মানে হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তার ভবন বা গৃহ। এমন জায়গাকে দারুস সালাম বলা হয়েছে যেখানে কোন বিপদ, ক্ষতি, দুঃখ ও কষ্ট নেই।

৩৩. তারা কেবল তাদের নেকী অনুযায়ীই প্রতিদান পাবে না বরং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে পুরস্কৃতও করবেন।

৩৪. অর্থাৎ নেককারদের মোকাবিলায় বদকারদের সাথে যে ব্যবহার করা হবে তা হচ্ছে এই যে, তারা যে পরিমাণ খারাপ কাজ করেছে তাদেরকে সেই পরিমাণ শাস্তি দেয়া হবে। অপরাধের চাইতে একটু সামান্য পরিমাণ বেশী শাস্তিও তাদেরকে দেয়া হবে না। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা নামল ১০৯ (ক) টীকা)।

৩৫. অর্থাৎ পাকড়াও হবার এবং উদ্ধার পাওয়ার সকল আশা তিরোহিত হবার পর অপরাধীদের চেহারার ওপর যে অন্ধকার ছেয়ে যায়।

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ
مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ
رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ
حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

৪ রুকূ’

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, "কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দেয়? এই শুনার ও দেখার শক্তি কার কর্তৃত্বে আছে? কে প্রাণহীন থেকে সজীবকে এবং সজীব থেকে প্রাণহীনকে বের করে? কে চালাচ্ছে এই বিশ্ব–ব্যবস্থাপনা? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। বলো, তবুও কি তোমরা (সত্যের বিরোধী পথে চলার ব্যাপারে) সতর্ক হচ্ছো না? তাহলে তো এ আল্লাহই তোমাদের আসল রব।[৩৮] কাজেই সত্যের পরে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি বাকি আছে? সুতরাং তোমরা কোন্‌দিকে চালিত হচ্ছো?[৩৯] (হে নবী! দেখো) এভাবে নাফরমানীর পথ অবলম্বনকারীদের ওপর তোমার রবের কথা সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবে না।[৪০]

৩৬. মূল আয়াতে বলা হয়েছে فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ কোন কোন তাফসীরকার এর অর্থ করেছেন ঃ আমরা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করবো, যাতে কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা পরস্পরকে মর্যাদা না দেয়। কিন্তু এ অর্থ প্রচলিত আরবী বাকরীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। আরবী বাকরীতি অনুযায়ী এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবো অথবা তাদেরকে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেবো। এ অর্থ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে আমরা এ বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করেছি যে, "তাদের মধ্য থেকে আমি অপরিচিতির পরদা সরিয়ে দেবো।" অর্থাৎ মুশরিকরা ও তাদের উপাস্যরা সামনাসামনি অবস্থান করবে এবং উভয় দলের পরিচিতি উভয়ের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। মুশরিকরা জানবে, এদেরকেই আমরা দুনিয়ায় মাবুদ বানিয়ে রেখেছিলাম। অন্যদিকে তাদের মাবুদরাও জানবে এরাই তাদেরকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছিল।

৩৭. অর্থাৎ এমন সব ফেরেশতা যাদেরকে দুনিয়ায় দেবদেবী বানিয়ে পূজা করা হয়েছে এবং এমন সব জিন, রূহ, পূর্ববর্তী মনীষী, পূর্ব পুরুষ, নবী, অলী, শহীদ ইত্যাদি যাদেরকে আল্লাহর গুণাবলীতে অংশীদার করে এমন অধিকারসমূহ দান করা হয়েছে যেগুলো

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের তৈরী করা শরীকদের মধ্যে কেউ আছে কি যে সৃষ্টির সূচনা করে আবার তার পুনরাবৃত্তিও করে?—বলো, একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করে এবং তার পুনরাবৃত্তিও ঘটান,[৪১] কাজেই তোমরা কোন্ উল্টো পথে চলে যাচ্ছো?[৪২]

তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের তৈরী করা শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে সত্যের দিকে পথনির্দেশ করে?[৪৩] বলো, একমাত্র আল্লাহই সত্যের দিকে পথনির্দেশ করেন তাহলে বলো, যিনি সত্যের দিকে পথনির্দেশ করেন তিনি আনুগত্য লাভের বেশী হকদার না যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না—সে বেশী হকদার? তোমাদের হয়েছে কি? কেমন উল্টো সিদ্ধান্ত করে বসছো?

আসলে তাদের বেশীরভাগ লোকই নিছক আন্দাজ–অনুমানের পেছনে চলছে।[৪৪] অথচ আন্দাজ–অনুমান দ্বারা সত্যের প্রয়োজন কিছুমাত্র মেটে না। তারা যা কিছু করছে তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন।

ছিল আল্লাহর অধিকার। তারা সেখানে নিজেদের পূজারীদেরকে পরিষ্কার বলে দেবে, তোমরা যে আমাদের পূজা করতে তা তো আমরা জানতামই না। তোমাদের কোন দোয়া, আকুতি, আবেদন, নিবেদন, ফরিয়াদ, নযরানা, মানত, শিরনী, প্রশংসা, স্তবস্তুতি, জপতপ এবং কোন সিজদা, বেদী চুম্বন ও দরগাহ প্রদাক্ষিণ আমাদের কাছে পৌছেনি।

৩৮. অর্থাৎ যদি এসবই আল্লাহর কাজ হয়ে থাকে, যেমন তোমরা নিজেরাও স্বীকার করে থাকো, তাহলে তো প্রামাণিত হলো যে, একমাত্র আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত মালিক, প্রতিপালক, প্রভু এবং তোমাদের বন্দেগী ও ইবাদাতের হকদার। কাজেই অন্যেরা, যাদের এসব কাজে কোন অংশ নেই তারা কেমন করে রবের দায়িত্বে শরীক হয়ে গেলো।

৩৯. মনে রাখতে হবে, এখানে সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে একথা বলা হচ্ছে না যে, তোমরা কোন্ দিকে চলে যাচ্ছো? বরং বলা হচ্ছে, "তোমরা কোন্ দিকে চালিত হচ্ছো?" এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, এমন কিছু বিভ্রান্তকারী ব্যক্তি বা দল আছে যারা লোকদেরকে সঠিক দিক থেকে টেনে নিয়ে ভুল দিকে ফিরিয়ে দেয়। তাই মানুষকে আবেদন জানানো হচ্ছে, তোমরা অন্ধ হয়ে ভুল পথপ্রদর্শনকারীদের পেছনে ছুটে যাচ্ছো কেন? নিজেদের বুদ্ধি ব্যবহার করে চিন্তা করছো না কেন যে, প্রকৃত সত্য যখন এই, তখন তোমাদেরকে কোন্ দিকে চালিত করা হচ্ছে? এরূপ ক্ষেত্রে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় লোকদেরকে এ ধরনের প্রশ্ন করার রীতি অনুসৃত হয়েছে। এসব জায়গায় বিভ্রান্তকারীদের নাম না নিয়ে তাদেরকে উহ্য বা পর্দান্তরালে রাখা হয়েছে, যাতে তাদের ভক্ত-অনুরক্তরা ঠাণ্ডা মাথায় নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে এবং কোন ব্যক্তি একথা বলে তাদেরকে উত্তেজিত করার এবং তাদের চিন্তাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভারসাম্য বিনষ্ট করার সুযোগ না পায় যে, দেখো তোমাদের মুরব্বী ও নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করা হচ্ছে এবং তাদেরকে আঘাত দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে প্রচার কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এ ব্যাপারে সজাগ থাকা উচিত।

৪০. অর্থাৎ এমনি ধরনের সব স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ও সহজবোধ্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে বক্তব্য বুঝানো হয় কিন্তু যারা মানবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছে তারা একগুঁয়েমীর বশবর্তী হয়ে কোন প্রকারেই মেনে নিচ্ছে না।

৪১. সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে মুশরিকরাও স্বীকার করতো যে, এটা একমাত্র আল্লাহরই কাজ। তাঁর সাথে যাদেরকে তারা শরীক করে তাদের কারো এ কাজে কোন অংশ নেই। আর সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির ব্যাপারটিও সুস্পষ্ট। অর্থাৎ প্রথমে যিনি সৃষ্টি করেন তাঁর পক্ষেই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু যে প্রথমবারই সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি সে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে পারে কেমন করে? এটি যদিও একটি অকাট্য যুক্তিসংগত কথা এবং মুশরিকদের মন ও ভেতর থেকে এর সত্যতার সাক্ষ দিতো তবুও তারা শুধুমাত্র এ কারণে একথা স্বীকার করতে ইতস্তত করতো যে, এটা মেনে নিলে পরকাল অস্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণেই পূর্ববর্তী প্রশ্নের জবাবে তো আল্লাহ বললেন যে, তারা নিজেরাই বলবে যে, এটা আল্লাহর কাজ। কিন্তু এখানে এর পরিবর্তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হচ্ছে, তুমি জোরালো কণ্ঠে বলে দাও প্রথমবারের সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি সবই একমাত্র আল্লাহর কাজ।

৪২. অর্থাৎ যখন তোমাদের জীবনের সূচনার প্রান্তভাগ আল্লাহর হাতে এবং শেষের প্রান্ত ভাগও তাঁরই হাতে। তখন নিজেদের কল্যাণকামী হয়ে একবার ভেবে দেখো, তোমাদের কিভাবে একথা বুঝানো হচ্ছে যে, এ দুই প্রান্তের মাঝখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য জন তোমাদের বন্দেগী ও নযরানা লাভের অধিকার লাভ করেছে?

৪৩. এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। একটু বিস্তারিতভাবে এটিকে বুঝে নিতে হবে। দুনিয়ায় মানুষের প্রয়োজন শুধুমাত্র তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও জীবন যাপনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লাভ করা এবং বিপদ-আপদ ও ক্ষতি থেকে সংরক্ষিত থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং জীবন যাপন করার সঠিক পদ্ধতি জানাও তার একটি প্রয়োজন (এবং সবচেয়ে বড় প্রয়োজন)। তার আরো জানতে হবে, নিজের ব্যক্তিগত সত্তার

সাথে, নিজের শক্তি, সামর্থ, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার সাথে, পৃথিবীতে যে উপায়-উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জাম তার কর্তৃত্বাধীনে আছে তার সাথে, যে অসংখ্য মানুষের সাথে বিভিন্নভাবে তাকে জড়িত হতে হয় তাদের সাথে এবং সামগ্রিকভাবে যে বিশ্ব ব্যবস্থার আওতাধীনে তাকে কাজ করতে হয় তার সাথে তার কি ব্যবহার করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে। এটা জানা এ জন্য প্রয়োজন যেন তার জীবন সামগ্রিকভাবে সফলকাম হয় এবং তার প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম বিভিন্ন ভুল পথে নিয়োজিত হয়ে ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়। এ সঠিক পদ্ধতির নাম হক বা সত্য আর যে পথনির্দেশনা মানুষকে এ পদ্ধতির দিকে নিয়ে যায় সেটিই 'হকের হেদায়াত' বা 'সত্যের পথনির্দেশনা।' কুরআন সমস্ত মুশরিককে এবং নবীর শিক্ষা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এমন সকল লোককে জিজ্ঞেস করে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের বন্দেগী করো তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যার মাধ্যমে তোমরা 'সত্যের পথনির্দেশনা' লাভ করতে পার? অবশ্যি সবাই জানে, এর জবাব 'না' ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের বন্দেগী করে তারা দুটি বড় বড় ভাগে বিভক্ত।

এক ঃ দেব-দেবী, জীবিত ও মৃত মানুষ, যাদের পূজা করা হয়। তারা অলৌকিক পদ্ধতিতে মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করবে এবং তাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে-এ উদ্দেশ্যেই মানুষ তাদের দিকে রুজু হয়। আর সত্যের পথনির্দেশনার ব্যাপারে বলা যায়, এ জিনিসটা কখনো ঐসব দেব-দেবী ইত্যাদির পক্ষ থেকে আসেওনি, মুশরিকরাও কখনো এ জন্য তাদের কাছে ধর্ণা দেয়নি এবং কোন মুশরিক একথা বলেও না যে, তার দেবতারা তাকে নৈতিকতা, সামাজিক জীবন-যাপন পদ্ধতি, সাংস্কৃতিক বিধান, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন-আদালত ইত্যাদির মূলনীতি শেখায়।

দুই ঃ এমন ধরনের মানুষ যাদের রচিত নীতিমালা ও আইনের আনুগত্য করা হয়। এ দিক দিয়ে তারা যে নেতা এবং পথপ্রদর্শক, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তারা কি সত্যপন্থী নেতা বা নেতা হতে পারে? মানুষের জীবন যাপনের সঠিক মূলনীতি রচনা করার জন্য যেসব তত্ব জানা প্রয়োজন তাদের কেউ কি সেসব সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখে? মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলো যে বিস্তীর্ণ পরিসরে ছড়িয়ে আছে, তাদের কারো দৃষ্টি কি তার সবটার ওপর পৌঁছে যায়? তাদের কেউ কি এমন সব দুর্বলতা, স্বার্থ প্রীতি, একদেশদর্শিতা, গোষ্ঠীপ্রীতি, ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত আশা-আকাংখা, লোভ-লালসা ও ঝোঁক প্রবণতা থেকে মুক্ত যা মানুষের সমাজ জীবনের জন্য ন্যায়নিষ্ঠ আইন প্রণয়নের পথে বাধা হয়ে থাকে? জবাব যদি না বাচক হয় এবং এ কথা সুস্পষ্ট যে, কোন সুস্থ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এ প্রশ্নগুলোর হাঁ বাচক জবাব দিতে পারবেন না তাহলে এরা কি সত্য পথনির্দেশনার উৎস হতে পারে?

এ কারণে কুরআন এ প্রশ্ন করে, হে লোকেরা! তোমাদের এ ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক প্রভুদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে তোমাদের সত্য সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করতে পারে? ওপরের প্রশ্নগুলোর সাথে মিলে এ শেষ প্রশ্নটি দীন ও ধর্মের সমগ্র বিষয়ের ফায়সালা করে দেয়। মানুষের সমস্ত প্রয়োজন দুই ধরনের, এক ধরনের প্রয়োজন হচ্ছে, তার একজন প্রতিপালক হবে, একজন আশ্রয়দাতা হবে, একজন প্রার্থনা শ্রবণকারী ও অভাব পূরণকারী হবে। এ কার্যকারণের জগতের অস্থায়ী ও অস্থিতিশীল সহায়গুলোর মধ্যে

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ
الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا
مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ
يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ
مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤٠﴾

আর এ কুরআন আল্লাহর অহী ও শিক্ষা ছাড়া রচনা করা যায় না। বরং এ হচ্ছে যা কিছু আগে এসেছিল তার সত্যায়ন এবং আল কিতাবের বিশদ বিবরণ।[৪৫] এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি বিশ্ব–জাহানের অধিকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে।

তারা কি একথা বলে যে, পয়গম্বর নিজেই এটি রচনা করেছে? বলো, "তোমাদের এ দোষারোপের ব্যাপারে তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে এরই মতো একটি সূরা রচনা করে আনো এবং এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে যাকে ডাকতে পারো সাহায্যের জন্য ডেকে নাও।[৪৬] আসল ব্যাপার হচ্ছে, যে জিনিসটি এদের জ্ঞানের আওতায় আসেনি এবং যার পরিণামও এদের সামনে নেই তাকে এরা (অনর্থক আন্দাজে) মিথ্যা বলে।[৪৭] এমনিভাবে এদের আগের লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছে। কাজেই দেখো জালেমদের পরিণাম কী হয়েছে! তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক ঈমান আনবে এবং কিছু লোক ঈমান আনবে না। আর তোমার রব এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে ভালভাবেই জানেন।[৪৮]

অবস্থান করে সে তার স্থায়ী সহায় অবলম্বন করতে পারবে। বস্তুত ওপরের প্রশ্নগুলো এ ফায়সালা করে দিয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এ প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারবে না। আর এক ধরনের প্রয়োজন হচ্ছে এই যে, এমন একজন পথপদর্শক থাকতে হবে যিনি দুনিয়ায় বসবাস করার সঠিক নীতি নির্ধারণ করে দেবেন এবং যার দেয়া জীবন বিধানের আনুগত্য পরিপূর্ণ আস্থার সাথে করা যেতে পারে। এই শেষ প্রশ্নটি এ ব্যাপারটিরও মীমাংসা করে দিয়েছে যে, একমাত্র আল্লাহই সেই পথপ্রদর্শক হতে পারেন। এরপরে একমাত্র জিদ

ও হঠকারিতা ছাড়া মানুষের মুশরিকী ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) তামাদ্দুনিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক নীতির সাথে লেপটে থাকার আর কোন কারণ থাকে না।

৪৪. অর্থাৎ যারা বিভিন্ন ধর্ম প্রবর্তন করেছে, দর্শন রচনা করেছে এবং জীবন বিধান তৈরী করেছে, তারাও এসব কিছু জ্ঞানের ভিত্তিতে নয় বরং আন্দাজ–অনুমানের ভিত্তিতে করেছে। আর যারা এসব ধর্মীয় ও দীনী নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করেছে তারাও জেনেবুঝে নয় বরং নিছক অনুমানের ভিত্তিতে তাদের পেছনে চলেছে। কারণ তারা মনে করে, এত বড় বড় লোকেরা যখন একথা বলেন এবং আমাদের বাপ–দাদারা এসব মেনে আসছেন আবার এ সংগে দুনিয়ার বিপুল সংখ্যক লোক এগুলো মেনে নিয়ে এ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই এই লোকেরা ঠিক কথাই বলে থাকবেন।

৪৫. "যা কিছু আগে এসে গিয়েছিল তার সত্যায়ণ"—অর্থাৎ শুরু থেকে নবীদের মাধ্যমে মানুষকে যে মৌলিক শিক্ষা দান করা হতে থাকে এ কুরআন তা থেকে সরে গিয়ে কোন নতুন জিনিস পেশ করছে না। বরং তার সত্যতা প্রমাণ করছে এবং তাকে পাকাপোক্ত করছে। যদি এটা কোন নতুন ধর্মপ্রবর্তকের মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী ক্ষমতার ফসল হতো, তাহলে অবশ্যি এর মধ্যে পুরাতন সত্যগুলোর সাথে কিছু নিজের অভিনব বক্তব্য মিশিয়ে দিয়ে এর একটা অভিনব ও বিশিষ্ট চরিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা দেখা যেতো।

"আল কিতাবের বিশদ বিবরণ"—অর্থাৎ সমস্ত আসমানী কিতাবের সারমর্ম যে মৌলিক শিক্ষাবলীর সমষ্টি, সেগুলো এর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে যুক্তি–প্রমাণ সহকারে উপদেশ দান ও বুঝাবার ভংগীতে, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং বাস্তব অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

৪৬. সাধারণভাবে লোকেরা এ চ্যালেঞ্জটিকে নিছক কুরআনের ভাষাশৈলী অলংকার ও সাহিত্য সুষমার দিক দিয়ে ছিল বলে মনে করে। কুরআনের অলৌকিকতার ওপর যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে তার ফলে এ ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কুরআন যে, তার অনন্য ও অতুলনীয় হবার দাবীর ভিত্তি নিছক নিজের শাব্দিক সৌন্দর্য সুষমার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেনি, এ ধরনের সীমিত ব্যাপার থেকে কুরআনের মর্যাদা অনেক উর্ধে। নিসন্দেহে ভাষাশৈলীর দিক দিয়েও কুরআন নজিরবিহীন। কিন্তু মূলত যে জিনিসটির ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, কোন মানবিক মেধা ও প্রতিভা এহেন কিতাব রচনা করতে পারে না, সেটি হচ্ছে তার বিষয়বস্তু ও শিক্ষা। এর মধ্যে অলৌকিকতার যেসব দিক রয়েছে এবং যেসব কারণে বলা যায় যে, এটি নিসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা কিতাব এবং কোন মানুষের পক্ষে এ ধরনের কিতাব রচনা করা অসম্ভব, তা এ কুরআনেরই বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের বর্ণনা ইতিপূর্বে যেখানেই এসেছে সেখানে আমরা তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে এসেছি এবং পরবর্তিতেও করে যেতে থাকবো। তাই কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে এর আলোচনা করা হলো না। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আত–তূর টীকা ২৬, ২৭)।

৪৭. কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার দু'টি ভিত্তি হতে পারতো। গবেষণা করে তথ্য প্রমাণাদির মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যেতো যে, এটি বানোয়াট ও নকল। অথবা এতে যে

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾

৫ রুকূ'

যদি তারা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহলে তুমি বলে দাও, "আমার আমল আমার জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমি যা কিছু করি তার দায়িত্ব থেকে তোমরা মুক্ত এবং তোমরা যা কিছু করছো তার দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত।"[৪৯]

তাদের মধ্যে বহু লোক আছে যারা তোমার কথা শোনে। কিন্তু তুমি কি বধিরদের শুনাবে, তারা কিছু না বুঝলেও?[৫০] *তাদের মধ্যে বহু লোক আছে যারা তোমাকে দেখে। কিন্তু তুমি কি অন্ধদের পথ দেখাবে, তারা কিছু না দেখতে পেলেও?*[৫১] *আসলে আল্লাহ মানুষের প্রতি জুলুম করেন না, মানুষ নিজেই নিজের প্রতি জুলুম করে।*[৫২]

সত্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং যে খবর দেয়া হয়েছে তা মিথ্যা প্রমাণিত হলে তার ভিত্তিতে এ মিথ্যা সাব্যস্তকরণকে যুক্তিসঙ্গত মনে করা যেতো। কিন্তু মিথ্যা সাব্যস্ত করার এ দু'টি কারণের মধ্য থেকে কোন একটি কারণও এখানে বর্তমান নেই। কোন ব্যক্তি একথা বলতে পারে না যে, এ কিতাবটি কেউ নিজে তৈরী করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছে, একথা সে তথ্য–জ্ঞানের ভিত্তিতে জানে। কেউ অদৃশ্যের পরদা উন্মোচন করে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখেও নেয়নি যে, সত্যিই সেখানে বহুসংখ্যক খোদা রয়েছে এবং এ কিতাবটিতে অনর্থক শুধুমাত্র একজন ইলাহর কথা শুনানো হচ্ছে। অথবা আসলে আল্লাহ, ফেরেশতা, অহী ইত্যাদির কোন সত্যতাই নেই এবং এ কিতাবে অযথা এসব গালগল্প বানিয়ে নেয়া হয়েছে। কেউ মরে গিয়েও দেখে নেয়নি যে, এ কিতাবে বর্ণিত পরকালীন জীবন এবং তার হিসাব নিকাশ ও শাস্তি–পুরস্কারের সমস্ত কাহিনীই মিথ্যা। কিন্তু এ সত্ত্বেও নিছক সন্দেহ ও ধারণার ভিত্তিতে এমনভাবে একে মিথ্যা বলা হচ্ছে যে, তাতে মনে হয় যেন এটি যে নকল ও মিথ্যা তা তাত্ত্বিকভাবেই চূড়ান্ত অনুসন্ধানের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়ে গেছে।

৪৮. যারা ঈমান আনে না তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আল্লাহ এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে খুব ভাল করেই জানেন।" অর্থাৎ নবীর কথা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না বলে সদিচ্ছা সহকারেই আমরা তা মেনে নিতে পারছি না। এরূপ অজুহাত দিয়ে তারা দুনিয়াবাসীর মুখ বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু মনের গোপন কথা যিনি জানেন সেই আল্লাহ তাদের প্রতিটি ব্যক্তি সম্পর্কে জানেন, সে কিভাবে নিজের হৃদয় ও মস্তিষ্কের দরজায় তালা এঁটে দিয়েছে, নিজেই নিজেকে গাফলতির সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে, নিজের বিবেকের কন্ঠরোধ করেছে, নিজের অন্তরে সত্যের সাক্ষকে দমিয়ে দিয়েছে এবং নিজের মস্তিষ্ক থেকে সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতার বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। সে শুনেও শোনেনি। বুঝেও না বুঝার ভান করেছে। সত্যের মোকাবিলায় নিজের অন্ধ বিদ্বেষকে, নিজের পার্থিব স্বার্থকে নিজের বাতিলের সাথে সংঘর্ষমুখর স্বার্থকে এবং নিজের নফসানী খাহেশ ও আগ্রহকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাই সে "নিষ্পাপ ভ্রষ্টাচারী" নয় বরং প্রকৃত অর্থে বিপর্যয়কারী।

৪৯. অর্থাৎ অযথা বিরোধ ও কূটতর্ক করার কোন প্রয়োজন নেই। যদি আমি মিথ্যা আরোপ করে থাকি তাহলে আমার কাজের জন্য আমি দায়ী হবো। এর কোন দায়ভার তোমাদের ওপর পড়বে না। আর যদি তোমরা সত্য কথাকে মিথ্যা বলে থাকো তাহলে এর মাধ্যমে আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং এর দ্বারা তোমরা নিজেদেরই ক্ষতি করছো।

৫০. শ্রবণ কয়েক রকমের হতে পারে। পশুরা যেমন আওয়াজ শোনে তেমনি এক ধরনের শ্রবণ আছে। আবার আর এক ধরনের শ্রবণ হয়, যার মধ্যে অর্থের দিকে নজর থাকে এবং এমনি ধরনের একটা প্রবণতা দেখা দেয় যে, যুক্তিসংগত কথা হলে মেনে নেয়া হবে। যারা কোন প্রকার বদ্ধ ধারণা বা অন্ধ বিদ্বেষে আক্রান্ত থাকে এবং যারা আগে থেকেই ফায়সালা করে বসে থাকে যে, নিজের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আকীদা–বিশ্বাস ও পদ্ধতিসমূহের বিরুদ্ধে এবং নিজের প্রবৃত্তির আশা–আকাংখা ও আগ্রহ বিরোধী কথা যত যুক্তিসংগতই হোক না কেন মেনে নেবো না, তারা সবকিছু শুনেও আসলে কিছুই শোনে না। তেমনিভাবে যারা দুনিয়ায় পশুদের মতো উদাসীন জীবন যাপন করে, চারদিকে বিচরণ করা ছাড়া আর কিছুতেই যাদের আগ্রহ নেই অথবা যারা প্রবৃত্তির স্বাদ–আনন্দের পেছনে এমন পাগলের মতো দৌড়ায় যে, তারা নিজেরা যা কিছু করছে তার ন্যায় বা অন্যায় হবার কথা চিন্তা করে না তারা শুনেও শোনে না। এ ধরনের লোকদের কান বধির হয় না কিন্তু মন বধির হয়।

৫১. ওপরের বাক্যাংশে যে কথা বলা হয়েছে এখানেও সেই একই কথা বলা হয়েছে। চোখের দৃষ্টি উন্মুক্ত থাকলে কোন লাভ নেই, চোখ দিয়ে তো পশুরাও দেখে। আসল জিনিস হচ্ছে মনের দৃষ্টি উন্মুক্ত থাকা। এ জিনিসটি যদি কারোর অর্জিত না হয়ে থাকে তাহলে সে সবকিছু দেখেও কিছুই দেখে না।

এ আয়াত দু'টিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তিনি যাদের সংশোধন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ উচ্চারণ করা হচ্ছে। আর এ নিন্দাবাদের উদ্দেশ্য নিছক নিন্দাবাদ নয় বরং বিদ্রূপবানে বিদ্ধ করে তাদের সুপ্ত মনুষত্বকে জাগিয়ে তোলা এবং চোখ ও কানের মাধ্যমে তাদের মনের ভেতরে প্রবেশ করার পথ খুলে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এভাবে যুক্তিসঙ্গত কথা ও সমবেদনাপূর্ণ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

(আজ তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে মত্ত হয়ে আছে) আর যেদিন আল্লাহ তাদেরকে একত্র করবেন সেদিন (এ দুনিয়ার জীবন তাদের কাছে এমন ঠেকবে) যেন মনে হবে তারা পরস্পরের মধ্যে পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে নিছক একদণ্ডের জন্য অবস্থান করেছিল।[৫৩] (সে সময় নিশ্চিতভাবে জানা যাবে) প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে মিথ্যা বলেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে[৫৪] এবং তারা মোটেই সঠিক পথে ছিল না। তাদেরকে যেসব খারাপ পরিণামের ভয় দেখাচ্ছি সেগুলোর কোন অংশ যদি তোমার জীবদ্দশায় দেখিয়ে দেই অথবা এর আগেই তোমাকে উঠিয়ে নেই, সর্বাবস্থায় তাদের আমারই দিকে ফিরে আসতে হবে এবং তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তার সাক্ষী।

প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রসূল রয়েছে।[৫৫] যখন কোন উম্মতের কাছে তাদের রসূল এসে যায় তখন পূর্ণ ইনসাফ সহকারে তাদের বিষয়ের ফায়সালা করে দেয়া হয় এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হয় না।[৫৬]

উপদেশ সেখানে পৌঁছতে পারবে। এ বর্ণনা পদ্ধতিটি কিছুটা এমনি ধরনের যেমন কোন সৎলোক অসৎলোকদের মাঝে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী সহকারে বাস করতে থাকে এবং অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দরদসহকারে তারা যে পতনশীল অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে সে সম্পর্কে তাদের মনে অনুভূতি জাগাতে থাকে। তাদের জীবন যাপন প্রণালীতে কি কি গলদ আছে এবং সঠিক জীবন যাপন প্রণালী কি তা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে ও যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে সে তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাঁর পূত–পবিত্র জীবন থেকে কেউ শিক্ষা নিচ্ছে না এবং তার এ শুভাকাংখামূলক উপদেশকেও কেউ গ্রাহ্য করছে না। এ অবস্থায় যখন সে তাদেরকে বুঝাবার কাজে ব্যস্ত রয়েছে এবং তারা তার কথাগুলোর প্রতি কর্ণপাত করছে না ঠিক এমন সময় তার কোন বন্ধু এসে তাকে বলে, আরে ভাই এ তুমি কি করছো? তুমি এমন লোকদের শুনাচ্ছো যারা কানে শুনে না এবং এমন লোকদের পথ দেখাচ্ছো যারা চোখে দেখে না। এদের মনের কানে তালা লেগেছে এবং এদের হৃদয়ের

চোখ কানা হয়ে গেছে। এ সৎলোককে তার সংস্কার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখা তার বন্ধুর একথা বলার উদ্দেশ্য নয় বরং তার উদ্দেশ্য হয়, হয়তো এ বিদ্রূপ ও তিরস্কারের ফলে অচেতন লোকদের কিছুটা চেতনা ফিরে আসবে।

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ তো তাদের কানও দিয়েছেন এবং মনও দিয়েছেন। হক ও বাতিলের পার্থক্য দেখার ও বুঝার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন কোন জিনিস তিনি নিজের পক্ষ থেকে তাদের দিতে কার্পণ্য করেননি। কিন্তু লোকেরা প্রবৃত্তির দাসত্ব ও দুনিয়ার প্রেমে মত্ত হয়ে নিজেরাই নিজেদের চোখ কানা করে নিয়েছে, কানে তালা লাগিয়েছে এবং অন্তরকে বিকৃত করে ফেলেছে। ফলে তার মধ্যে ভাল-মন্দের পার্থক্য, ভুল-নির্ভুলের জ্ঞান এবং বিবেকের সজীবতার কোন লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

৫৩. অর্থাৎ যখন একদিকে তাদের সামনে থাকবে আখেরাতের অনন্ত জীবন এবং অন্যদিকে তারা পেছন ফিরে নিজেদের পৃথিবীর জীবনের দিকে তাকাবে তখন তাদের ভবিষ্যতের তুলনায় নিজেদের এ অতীত বড়ই সামান্য ও নগণ্য মনে হবে। সে সময় তারা একথা উপলব্ধি করতে পারবে যে, তারা নিজেদের পূর্ববর্তী জীবনের সামান্য স্বাদ ও লাভের বিনিময়ে নিজেদের এ চিরন্তন ভবিষ্যত নষ্ট করে কত বড় বোকামি করেছে!

৫৪. অর্থাৎ একদিন আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে, একথাকে মিথ্যা বলেছে।

৫৫. এ "উম্মত" শব্দটি এখানে শুধুমাত্র সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং একজন রসূলের আগমনের পর তাঁর দাওয়াত যেসব লোকের কাছে পৌঁছে তারা সবাই তাঁর উম্মতভুক্ত হয়ে যায়। তাছাড়া রসূলকে তাদের মধ্যে জীবিত অবস্থায় উপস্থিত থাকতে হবে এটা এ জন্য অপরিহার্য নয়। বরং রসূলের পরেও যতদিন পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা অবিকৃত থাকবে এবং তিনি মূলত কিসের তালীম দিতেন এ বিষয়টা জানা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যতদিন সম্ভব হবে ততদিন পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তাঁরই উম্মত গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সামনের দিকে যে বিধানের আলোচনা আসছে তা তাদের ওপর কার্যকর হবে। এ দৃষ্টিতে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পর সারা দুনিয়ার মানুষ তাঁর উম্মতভুক্ত। যতদিন কুরআন তার নির্ভুল ও নির্ভেজাল অবস্থায় প্রকাশিত হতে থাকবে ততদিন এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। এ কারণে আয়াতে একথা বলা হয়নি যে, "প্রত্যেক জাতির (বা সম্প্রদায়ের) মধ্যে একজন রসূল রয়েছে" বরং বলা হয়েছে, "প্রত্যেক উম্মতের জন্য একজন রসূল রয়েছে।"

৫৬. এর অর্থ হচ্ছে, রসূলের দাওয়াত কোন মানব গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর ধরে নিতে হবে যে, সেই গোষ্ঠীর হেদায়াতের জন্য আল্লাহর যা কিছু করণীয় ছিল, তা করা হয়ে গেছে। এরপর কেবল ফায়সালা করাই বাকি থেকে যায়। অতিরিক্ত কোন যুক্তি বা সাক্ষ-প্রমাণের অবকাশ থাকে না। আর চূড়ান্ত ইনসাফ সহকারে এ ফায়সালা করা হয়ে থাকে। যারা রসূলের কথা মেনে নেয় এবং নিজেদের নীতি ও মনোভাব পরিবর্তন করে তারা আল্লাহর রহমত লাভের অধিকারী হয়। আর যারা তাঁর কথা মেনে নেয় না তারা শাস্তি লাভের যোগ্য হয়। তাদেরকে এ শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় দেয়া যেতে পারে বা এক জায়গায়।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا
وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ
سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا
مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنتُم بِهِ ۚ آلْآنَ
وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ
الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾ وَيَسْتَنبِئُونَكَ
أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾

তারা বলে, যদি তোমার এ হুমকি সত্য হয় তাহলে এটা কবে কার্যকরী হবে? বলো, "নিজের লাভ–ক্ষতিও আমার ইখতিয়ারে নেই। সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।[৫৭] প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটি নির্দিষ্ট সময় আছে, এ সময় পূর্ণ হয়ে গেলে তারা মুহূর্তকালও সামনে পেছনে করতে পারবে না।[৫৮] তাদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো একথাও চিন্তা করেছো যে, যদি আল্লাহর আযাব অকস্মাত রাতে বা দিনে এসে যায় (তাহলে তোমরা কি করতে পারো)? এটা এমন কি জিনিস যে জন্য অপরাধীরা তাড়াহুড়া করতে চায়? সেটা যখন তোমাদের ওপর এসে পড়বে তখন কি তোমরা ঈমান আনবে? এখন বাঁচতে চাও? অথচ তোমরাইতো তাগাদা দিচ্ছিলে যে, ওটা শিগ্‌গির এসে পড়ুক। তারপর জালেমদেরকে বলা হবে, এখন অনন্ত আযাবের স্বাদ আস্বাদন করো, তোমরা যা কিছু উপার্জন করতে তার শাস্তি ছাড়া তোমাদের আর কি বিনিময় দেয়া যেতে পারে?

তারপর তারা জিজ্ঞেস করে যে, তুমি যা বলছো তা কি যথার্থই সত্য? বলো, "আমার রবের কসম, এটা যথার্থই সত্য এবং এর প্রকাশ হবার পথে বাধা দেবার মতো শক্তি তোমাদের নেই।"

৫৭. অর্থাৎ আমি কবে একথা বলেছিলাম যে, আমিই এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করবো এবং অমান্যকারীদেরকে আমিই শাস্তি দেবো? কাজেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হুমকি কবে কার্যকরী করা হবে, একথা আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? হুমকি তো আল্লাহ দিয়েছেন।

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّوا
النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾
أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي
الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

৬ রুকূ'

আল্লাহর নাফরমানী করেছে এমন প্রতিটি ব্যক্তির কাছে যদি সারা দুনিয়ার ধন–দৌলত থাকতো তাহলে সেই আযাব থেকে বাঁচার বিনিময়ে সে তা দিতে উদ্যত হতো। যখন তারা এ আযাব দেখবে তখন তারা মনে মনে পস্তাতে থাকবে।[৫৯] কিন্তু তাদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে ফায়সালা করা হবে, তাদের প্রতি কোন জুলুম হবে না। শোনো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। শুনে রাখো, আল্লাহর অংগীকার সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তিনিই জীবন দেন, তিনিই মৃত্যু দেন এবং তাঁরই দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে।

হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নসীহত এসে গেছে। এটি এমন জিনিস যা অন্তরের রোগের নিরাময় এবং যে তা গ্রহণ করে নেয় তার জন্য পথনির্দেশনা ও রহমত।

তিনিই তাঁর ফায়সালা বাস্তবায়িত করবেন। কখন ফায়সালা করবেন এবং কিভাবে তা তোমাদের সামনে আনবেন তা সব তাঁরই ইচ্ছাধীন।

৫৮. এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাড়াহুড়া করেন না। যখনই রসূলের দাওয়াত কোন ব্যক্তি বা দলের কাছে পৌছে যায়, তখনই যারা ঈমান আনে কেবল তারাই রহমতের হকদার হবে। এবং যারা তা মানতে অস্বীকার করবে অথবা মেনে নিতে ইতস্তত করবে তাদেরকে সংগে সংগে শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এটা আল্লাহর রীতি নয়। বরং আল্লাহর রীতি হচ্ছে, নিজের বাণী পৌছিয়ে দেবার পর তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত মর্যাদা অনুযায়ী এবং প্রত্যেক দল ও জাতিকে তার সামগ্রিক মর্যাদা অনুসারে চিন্তা–ভাবনা ও বোঝাপড়া করার জন্য যথেষ্ট সময় দেন। এ অবকাশকাল অনেক সময় শত শত বছর ধরে চলতে থাকে। এ ব্যাপারে কার কতটা অবকাশ পওয়া উচিত তা আল্লাহই ভাল জানেন।

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝٥٨ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ۝٥٩ وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝٦٠

হে নবী! বলো, "এ জিনিসটি যে, তিনি পাঠিয়েছেন এটি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাঁর মেহেরবানী। এ জন্য তো লোকদের আনন্দিত হওয়া উচিত। তারা যা কিছু জমা করছে সে সবের চেয়ে এটি অনেক ভাল।" হে নবী! তাদেরকে বলো, "তোমরা কি কখনো একথাও চিন্তা করেছো যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিক[৬০] অবতীর্ণ করেছিলেন তার মধ্য থেকে তোমরা নিজেরাই কোনটাকে হারাম ও কোনটাকে হালাল করে নিয়েছো?"[৬১] তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন? নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো?[৬২] যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে তারা কি মনে করে, কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে? আল্লাহ তো লোকদের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকরগুজারী করে না।[৬৩]

তারপর পুরোপুরি ইনসাফের ভিত্তিতে দেয়া এ অবকাশ যখন পূর্ণ হয়ে যায় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দল তার বিদ্রোহাত্মক নীতি পরিবর্তন করতে চায় না তখন এরি ভিত্তিতে তার ওপর আল্লাহ তাঁর ফায়সালা কার্যকর করেন। এ ফায়সালার সময়টি আল্লাহর নির্ধারিত সময় থেকে এক মুহূর্ত আগেও আসতে পারে না এবং সময় এসে যাবার পর মুহূর্তকালের জন্য তাকে ঠেকিয়ে রাখাও সম্ভব নয়।

৫৯. সারা জীবন তারা যে জিনিসটিকে মিথ্যা বলতে থাকে, যাকে মিথ্যা মনে করে সারাটা জীবন ভুল কাজে ব্যয় করে এবং যার সংবাদদানকারী পয়গম্বরদেরকে বিভিন্নভাবে দোষারোপ করতে থাকে, সেই জিনিসটি যখন তাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে গুড়িয়ে দিয়ে অকস্মাৎ সামনে এসে দাঁড়াবে তখন তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবে। এটিই যেহেতু যথার্থ সত্য ছিল তাই তারা দুনিয়ায় যা কিছু করে এসেছে তার পরিণাম এখন কি হওয়া উচিত তা তাদের বিবেকই তাদেরকে জানিয়ে দেবে। নিজের কৃতকর্মের হাত থেকে বাঁচার কোন পথ থাকে না। মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। লজ্জায় ও আক্ষেপে অন্তর ভিতরে ভিতরেই দমে যাবে। আন্দাজ ও অনুমানের ব্যবসায়ে যে ব্যক্তি তার সমস্ত পুঁজি ঢেলে দিয়েছে এবং

কোন শুভাকাংখীর কথা মেনে নেয়নি সে দেউলিয়া হয়ে যাবার পর তার নিজের ছাড়া আর কার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে?

৬০. রিযিক বলতে আমাদের ভাষায় শুধুমাত্র পানাহারের জিনিসপত্র বুঝায়। এ কারণে লোকেরা মনে করে ধর্মীয় সংস্কার ও রসম রেওয়াজের ভিত্তিতে খাদ্য সামগ্রীর ক্ষুদ্রতর পরিসরে লোকেরা যেসব আইন কানুন প্রণয়ন করে রেখেছে এখানে শুধুমাত্র তারই সমালোচনা করা হয়েছে। এ বিভ্রান্তিতে শুধুমাত্র অজ্ঞ–অশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষরাই ভুগছে না, শিক্ষিত সমাজ ও আলেমরাও এর শিকার হয়েছেন। অথচ আরবী ভাষায় রিযিক শব্দটি নিছক খাদ্যের অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং রকমারি দান, অনুদানও এর আওতাভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ দুনিয়ায় মানুষকে যা কিছু দিয়েছেন তা সবই তার রিযিক। এমন কি সন্তান–সন্ততিও রিযিক। আসমাউর রিজাল তথা রাবীদের জীবনী গ্রন্থসমূহে রিযুক, রুযাইক ও রিযকুল্লাহ নামে অসংখ্য রাবী পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আল্লাহ বখশ, খোদা বখ্শ নামগুলো প্রায় এই একই অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি বহুল প্রচলিত দোয়ার ভাষা হলো ঃ

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه

"হে আল্লাহ! সত্যকে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে দাও এবং আমাদের তার অনুসরণ করে চলার সুযোগ দাও।"

প্রচলিত আরবী প্রবাদে বলা হয়, " رُزِقَ عِلْمًا " অর্থাৎ অমুক ব্যক্তিকে তাত্ত্বিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ প্রত্যেক গর্ভবতীর পেটে একজন ফেরেশতা পাঠান। তিনি শিশুর রিযিক এবং তার আয়ু ও কর্ম লিখে দেন। এখানে রিযিক মানে শুধু খাদ্য নয়, যা ভূমিষ্ঠ হবার পরে এ শিশু লাভ করবে। বরং এ দুনিয়ায় তাকে যা কিছু দেয়া হবে সবই রিযিকের অন্তরভুক্ত। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ অর্থাৎ "যা কিছু আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে।" কাজেই রিযিককে নিছক খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং পানাহারের জিনিসের ব্যাপারে মানুষ নিজেই নিজের ওপর যেসব বিধি–নিষেধ ও স্বাধীনতা আরোপ করেছে আল্লাহ কেবল তার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন, একথা মনে করা মারাত্মক ভুল। এটা কোন সামান্য ভুল নয়। এর কারণে আল্লাহর দীনের একটি বিরাট মৌলিক ও নীতিগত শিক্ষা মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে। এ ভুলের ফলশ্রুতিতেই তো আজ পানাহারের জিনিসের মধ্যে হারাম ও হালাল এবং জায়েয ও নাজায়েযের ব্যাপারটিকে একটি দীনী বিষয় মনে করা হয় কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ব্যাপকতর বিষয়াবলীতে যদি এ নীতি স্থির করে নেয়া হয় যে, মানুষ নিজেই নিজের সীমা নির্দিষ্ট করে নেয়ার অধিকার রাখে এবং এ কারণে আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবমুক্ত হয়ে আইন প্রণয়ন করা হতে থাকে তাহলে সাধারণ লোক তো দূরের কথা দীনী উলামা, শরীয়াতের মুফতীবৃন্দ এবং কুরআনের মুফাসসির ও হাদীসের শায়খগণের পর্যন্ত এ অনুভূতি হয় না যে, পানাহারের সামগ্রীর ক্ষেত্রে আল্লাহর শরীয়াতের প্রভাবমুক্ত হয়ে জায়েয ও নাজায়েযের সীমা নির্ধারণ করার মতো এটিও দীনের সাথে সমান সংঘর্ষশীল।

৬১. অর্থাৎ তোমরা যে এটা কতবড় মারাত্মক বিদ্রোহাত্মক অপরাধ করছো তার কোন অনুভূতিই তোমাদের নেই। রিযিকের মালিক আল্লাহ। তোমরা নিজেরাও আল্লাহর অধীন। এ অবস্থায় আল্লাহর সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ এবং তা ব্যবহার ও ভোগ করার জন্য তার মধ্যে বিধি–নিষেধ আরোপ করার অধিকার তোমরা কোথা থেকে পেলে? কোন চাকর যদি দাবী করে প্রভুর সম্পত্তি ব্যবহার করার এবং তার ওপর যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তার নিজেরই বিধি–নিষেধ আরোপ করার অধিকার আছে এবং এ ব্যাপারে প্রভুর কিছু বলার আদতে কোন প্রয়োজনই নেই, তাহলে তার ব্যাপারে তোমরা কি বলবে? তোমাদের নিজেদের কর্মচারী যদি তোমাদের গৃহ এবং গৃহের যাবতীয় জিনিসপত্র ব্যবহার করার ও কাজে লাগাবার ব্যাপারে এ ধরনের স্বাধীনতা ও ক্ষমতার দাবী করে তাহলে তোমরা তার সাথে কেমন ব্যবহার করবে? আর যে চাকর আদতে এ কথাই মানে না যে, সে কারোর চাকর, কেউ তার প্রভু এবং তার হাতে যে সম্পদ আছে তা অন্য কারোর মালিকানাধীন, তার ব্যাপারটাই আলাদা। এখানে এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকের কথা আলোচনা করা হচ্ছে না। এখানে এমন ধরনের চাকরের কথা আলোচিত হচ্ছে, যে নিজে একথা মানে যে, সে কারোর চাকর এবং এই সাথে এ কথাও মানে যে, সে যার চাকর সে–ই সমস্ত সম্পদের মালিক। তারপর বলে, এ সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহার করার অধিকার আমি নিজে নিজেই লাভ করেছি এবং এ জন্য প্রভুকে জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন নেই।

৬২. অর্থাৎ তোমাদের এ মর্যাদা কেবলমাত্র তখনই সঠিক হতো যখন প্রভু নিজেই তোমাদের অধিকার দান করতেন এবং বলে দিতেন, আমার সম্পদ তোমরা যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করো এবং নিজেদের কাজ ও ব্যবহার করার সীমারেখা, আইন–কানুন ও নীতি–নিয়ম সবকিছু তৈরী করার যাবতীয় অধিকার তোমাদের দিয়ে দিলাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রভু তোমাদের এ অধিকার ও ক্ষমতা যে দিয়েছেন এ মর্মে তোমাদের কাছে সত্যিই প্রভুর দেয়া কোন প্রমাণ পত্র আছে কি? নাকি কোন প্রমাণপত্র ছাড়াই তোমরা এ দাবী করছো যে, তিনি তোমাদের সমস্ত অধিকার দান করেছেন? যদি প্রথমটি সত্য হয় তাহলে মেহেরবানী করে সেই প্রমাণপত্রটি দেখাও। আর দ্বিতীয়টি সত্য হলে একথা পরিষ্কার যে, তোমরা বিদ্রোহের সাথে সাথে মিথ্যাচার ও মিথ্যা দোষারোপের অপরাধও করছো।

৬৩. অর্থাৎ এটা তো প্রভুর অপার অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর ভৃত্যকে নিজেই বলে দিচ্ছেন, আমার গৃহে, আমার সম্পদে এবং স্বয়ং আমার ব্যাপারে কোন্ ধরনের কর্মনীতি অবলম্বন করলে তুমি আমার সন্তুষ্টি, পুরস্কার ও উন্নতি হাসিল করতে সক্ষম হবে এবং কোন্ কর্মনীতি অবলম্বন করলে অনিবার্যভাবে আমার ক্রোধ, শাস্তি ও অবনতির সম্মুখীন হবে। কিন্তু অনেক নির্বোধ ভৃত্য এ অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। অর্থাৎ তাদের মতে যেন এমনটি হওয়া উচিত ছিল যে, প্রভু তাদেরকে নিজের গৃহে এনে স্বাধীন ছেড়ে দিতেন এবং সব সম্পদ তাদের কর্তৃত্বাধীন করে দেবার পর কোন্ ভৃত্য কি করে তা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে থাকতেন। তারপর যখনই কেউ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে—যা কোন ভৃত্য বা চাকরের জানা নেই—কোন কাজ করতো তখনই তাকে তিনি শাস্তি দিয়ে দিতেন। অথচ প্রভু যদি তার চাকরদেরকে এমন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করতেন তাহলে তাদের এক জনেরও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হতো না।

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ
إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ
ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا
فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾

৭ রুকূ'

হে নবী! তুমি যে অবস্থায়ই থাকো এবং কুরআন থেকে যা কিছুই শুনাতে থাকো। আর হে লোকেরা, তোমরাও যা কিছু করো সে সবের মধ্যে আমি তোমাদের দেখতে থাকি। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে কোন অণুপরিমাণ বস্তুও এমন নেই, এবং তার চেয়ে ছোট বা বড় কোন জিনিসও নেই, যা তোমাদের রবের দৃষ্টির অগোচরে আছে এবং যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই।[৬৪] *শোনো, যারা আল্লাহর বন্ধু, ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে, তাদের কোন ভয় ও মর্মযাতনার অবকাশ নেই। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনে তাদের জন্য শুধু সুসংবাদই রয়েছে। আল্লাহর কথার পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসাফল্য। হে নবী! এরা তোমাকে যেসব কথা বলছে তা যেন তোমাকে মর্মাহত না করে। সমস্ত মর্যাদা আল্লাহর হাতে এবং তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।*

৬৪. নবীকে সান্ত্বনা দেয়া এবং তাঁর বিরোধীদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যেই এখানে এ কথার উল্লেখ করা হয়েছে। একদিকে নবীকে বলা হচ্ছে, সত্যের বাণী লোকদের কাছে প্রচার এবং আল্লাহর বান্দাদের সংশোধন করার জন্য তুমি যেভাবে জানপ্রাণ দিয়ে এবং সবর ও সহিষ্ণুতা সহকারে কাজ করে যাচ্ছো তার প্রতি আমি নজর রাখছি। এমন নয় যে, এ বিপদসংকুল কাজে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি তোমাকে অসহায় ছেড়ে দিয়েছি। যা

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

জেনে রেখো, আকাশের অধিবাসী হোক বা পৃথিবীর, সবাই আল্লাহর মালিকানাধীন। আর যারা আলাহকে বাদ দিয়ে (নিজেদের মনগড়া) কিছু শরীকদের ডাকছে তারা নিছক আন্দাজ ও ধারণার অনুগামী এবং তারা শুধু অনুমানই করে। তিনিই তোমাদের জন্য রাত তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা তাতে প্রশান্তি লাভ করতে পারো এবং দিনকে উজ্জ্বল করেছেন। এর মধ্যে শিক্ষা আছে এমন লোকদের জন্য যারা (খোলা কানে নবীর দাওয়াত) শোনে।[৬৫]

কিছু তুমি করছো তাও আমি দেখছি এবং যে আচরণ তোমার সাথে করা হচ্ছে সে সম্বন্ধেও আমি বেখবর নই। অন্যদিকে নবীর বিরোধীদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, একজন সত্যের আহবায়ক ও মানব হিতৈষীর সংস্কারধর্মী প্রচেষ্টার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তোমরা একথা মনে করে নিয়ো না যে, তোমাদের এসব কাজ কারবার দেখার মতো কেউ নেই এবং কখনো তোমাদেরকে এহেন কাজের জন্য কোন জবাবদিহি করতে হবে না। জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু করছো সবই আল্লাহর রেকর্ডে সংরক্ষিত হচ্ছে।

৬৫. এখানে আসলে একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বক্তব্যকে অত্যন্ত সংক্ষেপে কয়েক কথায় বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়ায় যারা অহী ও ইলহামের সাহায্যে সরাসরি প্রকৃত সত্যের সন্ধান পায় না, তাদের ধর্ম সম্বন্ধে মতামত প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে দার্শনিক সুলভ তত্ত্বানুসন্ধান। এর উদ্দেশ্য হলো, এ বিশ্ব-জাহানে বাহ্যত আমরা যা কিছু দেখছি ও অনুভব করছি তার পেছনে কোন সত্য লুকিয়ে আছে কিনা এবং থাকলে তা কি—এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করা। কোন ব্যক্তি চাই সে নাস্তিক্যবাদ অবলম্বন করুক বা শিরক অথবা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হোক। তার পক্ষে অবশ্যি কোন না কোন ধরনের দার্শনিক চিন্তা-গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের আশ্রয় না নিয়ে ধর্ম সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব নয়। আর নবীগণ যে ধর্ম পেশ করেছেন তা কেবল এভাবেই যাচাই করা যেতে পারে। অর্থাৎ দার্শনিক সুলভ চিন্তা–ভাবনার মাধ্যমে মানুষকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ততা অর্জন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে যে, নবী তাকে বিশ্ব–জাহানের বিভিন্ন নিদর্শনের পেছনে যে গভীর তত্ব ও সত্য লুকিয়ে থাকার সন্ধান দিচ্ছেন তার বিবেক মন তার প্রতি সায় দেয় কি না। এ অনুসন্ধানের সঠিক বা বেঠিক হওয়ার বিষয়টি পুরাপুরি নির্ভর করে অনুসন্ধান পদ্ধতির ওপর। এ পদ্ধতি ভুল হলে ভুল অভিমত গড়ে

উঠবে এবং সঠিক হলে সঠিক অভিমত গড়ে উঠবে। এখন বিশ্লেষণ করে দেখা যাক, দুনিয়ায় বিভিন্ন দল এ অনুসন্ধানের জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

মুশরিকরা নির্জলা সংশয়, কল্পনা ও অনুমানের ওপর নিজেদের অনুসন্ধানের ভিত গড়ে তুলেছে।

ইশরাকী সাধক ও যোগীরা যদিও মুরাকাবা তথা ধ্যানযোগের ভড়ং সৃষ্টি করেছেন এবং দাবী করেছেন যে, তারা বহিরাঙ্গের পেছনে উঁকি দিয়ে অভ্যন্তরের চেহারা দেখে নিয়েছেন কিন্তু আসলে তারা নিজেদের এ অনুসন্ধানের ভিত রেখেছেন আন্দাজ–অনুমানের ওপর। তারা আসলে নিজেদের আন্দাজ–অনুমানের বিষয় নিয়েই ধ্যান করেন। আর তারা এই যে বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা আসলে এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, অনুমানের ভিত্তিতে যে ধারণাটা তারা দাঁড় করিয়েছিলেন তারি ওপর তাদের চিন্তা–ভাবনাকে কেন্দ্রীভূত করেছেন। তারপর তার ওপর মস্তিষ্কের চাপ সৃষ্টি করেছেন, ফলে সেই একই ধারণাকে নিজেদের সামনে চলমান দেখতে পেয়েছেন।

দার্শনিকগণ যুক্তির সাহায্যে গৃহীত সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুসন্ধানের ভিত রূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আসলে তা আন্দাজ–অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এ আন্দাজ–অনুমান ভিত্তিক যুক্তি যে একেবারেই খোঁড়া যুক্তি, সে কথা উপলব্ধি করে তারা তর্কশাস্ত্র সম্মত যুক্তি প্রদান ও কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তিক যষ্ঠির ওপর ভর দিয়ে তাকে চালাবার চেষ্টা করেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন যুক্তি ভিত্তিক সিদ্ধান্ত।

বিজ্ঞানীগণ যদিও বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে অনুসন্ধান ও গবেষণার জন্য তাত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তবুও অতিপ্রাকৃতের সীমানায় পা ফেলার সাথে সাথেই তারাও তাত্বিক পদ্ধতি পরিহার করে আন্দাজ–অনুমান ও ধারণা–কল্পনার পেছনে চলেছেন।

আবার এ দলগুলোর আন্দাজ–অনুমান সংকীর্ণ দল প্রীতি, অন্ধ বিদ্বেষ ও স্বার্থ–প্রীতি রোগেও আক্রান্ত হয়েছে। ফলে তারা অন্যের কথা না শোনার জিদ ধরে বসেছে এবং নিজেদের প্রিয় পথের ওপর হাত–পা গুটিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছে।

কুরআন এ ধরনের অনুসন্ধান পদ্ধতিকে আগাগোড়াই ভুল গণ্য করে। কুরআন বলে, তোমাদের পথভ্রষ্টতার আসল কারণ হচ্ছে এই যে, তোমরা সত্যানুসন্ধানের ভিত্তি রাখো আন্দাজ–অনুমান ও ধারণা–কল্পনার ওপর। আবার অন্ধ দল–প্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থ–বিদ্বেষের শিকার হয়ে অন্যের যুক্তিসংগত কথাও শুনতে রাজী হও না। এ দ্বিবিধ ভুলের কারণে তোমাদের পক্ষে সত্যের সন্ধান লাভ অসম্ভব তো ছিলই, এমন কি নবীগণ যে দীন পেশ করেছেন তাকে যাচাই পর্যালোচনা করে সঠিক পথে অগ্রসর হওয়াও অসম্ভব হয়ে গেছে।

এর মোকাবিলায় কুরআন দার্শনিক অনুসন্ধান গবেষণার জন্য যে সঠিক তাত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পথের সন্ধান দিয়েছে তা হচ্ছে এই যে, যারা দাবী করছে, আমরা ধারণা–কল্পনা, আন্দাজ–অনুমান ও ধ্যান–তপস্যার মাধ্যমে নয় বরং যথার্থ "নিশ্চিত জ্ঞানের" ভিত্তিতে তোমাদের সামনে প্রকৃত সত্যের বর্ণনা দিচ্ছি। প্রথমে তাদের বর্ণনা সকল প্রকার সংকীর্ণ, দল–প্রীতি ও স্বার্থ–বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে মনোযোগ দিয়ে শোনো। তারপর বিশ্ব–জাহানে যেসব নিদর্শন (কুরআনের পরিভাষায় "আয়াত"সমূহ) তোমাদের

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۭ بِهٰذَا ۚ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾ قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٠﴾

লোকেরা বলে, আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন।[৬৬] সুবহানাল্লাহ—তিনি মহান-পবিত্র।[৬৭] তিনি তো অভাবমুক্ত। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর মালিকানাধীন।[৬৮] একথার সপক্ষে তোমাদের কাছে কি প্রমাণ আছে? তোমরা কি আল্লাহর সপক্ষে এমন সব কথা বলো যা তোমাদের জানা নেই? হে মুহাম্মাদ! বলো, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা কখনো সফলকাম হতে পারে না। দুনিয়ার দু'দিনের জীবন ভোগ করে নাও, তারপর আমার দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন তারা যে কুফরী করছে তার প্রতিফল স্বরূপ তাদেরকে কঠোর শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।

দৃষ্টিগোচর ও অভিজ্ঞতালব্ধ হয় সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো, সেগুলোর সাক্ষ সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করো এবং অনুসন্ধান করতে থাকো যে, এ বাহ্যিক অবয়বের পেছনে যে সত্যের প্রতি এরা অংগুলি নির্দেশ করছেন তার প্রতি ইংগিতকারী আলামত তোমরা ঐ বাহ্যিক অবয়বেই পাচ্ছো কিনা? যদি এ ধরনের আলামত দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাদের ইংগিতও সুস্পষ্ট হয় তাহলে যাদের বর্ণনা নিদর্শনসমূহের সাক্ষ্য অনুযায়ী পাওয়া যাচ্ছে তাদেরকে অযথা মিথ্যুক বলার আর কোন কারণ নেই। এ দর্শন পদ্ধতিই ইসলামের ভিত্তি। দুঃখের বিষয় এ পদ্ধতি পরিত্যাগ করে মুসলিম দার্শনিকগণও প্লেটো ও এরিষ্টটলের পদাংক অনুসরণ করছেন।

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে শুধুমাত্র এ পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়াই হয়নি বরং বিশ্ব-জাহানের নিদর্শনসমূহ পেশ করে তার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এবং প্রকৃত সত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছার যথারীতি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এভাবে চিন্তা-ভাবনা ও অনুসন্ধান করার এ পদ্ধতি মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হবে। এখানে এ আয়াতেও উদাহরণ স্বরূপ শুধুমাত্র দু'টি নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ রাত ও দিন। আসলে সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্বের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সুশৃংখল পরিবর্তনের কারণে রাত-দিনের ওলটপালট ও বিপ্লব সাধিত হয়। এটি একজন বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপক এবং সমগ্র বিশ্ব-জগতের ওপর নিরংকুশ কর্তৃত্বশালী শাসকের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট আলামত। এর মধ্যে

সুস্পষ্ট কুশলতা, নৈপুণ্য, বিজ্ঞতা ও উদ্দেশ্যমূলক তৎপরতাও দেখা যায়। কারণ দুনিয়ার সমস্ত বস্তুর অসংখ্য প্রয়োজন ও অভাব পূরণ এ দিন–রাতের আবর্তনের সাথে যুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে প্রভুত্ব, কৃপাশীলতা ও প্রতিপালনের সুস্পষ্ট আলামতও পাওয়া যায়। কারণ এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যিনি পৃথিবীর বুকে এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন তিনি নিজেই তাদের স্থিতি ও স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোও সরবরাহ করেন। এ থেকে এও জানা যায় যে, এ বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপক মাত্র একজন, তিনি কোন ক্রীড়ামোদী বা তামাসাপ্রিয় নন, খেলাচ্ছলে এ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করেননি এবং সেভাবে একে চালাচ্ছেনও না বরং তিনি প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞানময় এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে তিনি কাজ করছেন। এ থেকে এও জানা যায় যে, অনুগ্রহকারী ও পালনকারী হিসেবে তিনিই ইবাদাত লাভের হকদার এবং দিন–রাতের আবর্তনের অধীন কোন সত্তাই রব ও প্রভু নয় বরং রবের অধীনস্থ দাস। এইসব নিদর্শনগত সুস্পষ্ট সাক্ষ্যের মোকাবিলায় মুশরিকরা আন্দাজ–অনুমান ও ধারণা–কল্পনার ভিত্তিতে যে ধর্ম উদ্ভাবন করেছে তা কিভাবে সঠিক হতে পারে?

৬৬. ওপরের আয়াতগুলোতে মানুষের জাহেলী ধ্যান–ধারণা ও মূর্খতার সমালোচনা করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, তোমরা নিজেদের ধর্মের ভিত রাখো প্রত্যয় মিশ্রিত জ্ঞানের পরিবর্তে আন্দাজ ও অনুমানের ওপর। তারপর যে ধর্মের অনুসারী হয়ে তোমরা এগিয়ে যাও তার পেছনে কোন যুক্তি–প্রমাণ আছে কি না, কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ মর্মে অনুসন্ধান করার কোন চেষ্টাই করো না। এখন এ প্রসংগে খৃষ্টান ও অন্যান্য কতিপয় ধর্মাবলম্বীদের এ অজ্ঞতার সমালোচনা এ বলে করা হয়েছে যে, তারা নিছক আন্দাজ–অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে নিয়েছে।

৬৭. সুবহানাল্লাহ শব্দটি কখনো বিস্ময় প্রকাশ করার জন্য বলা হয় আবার কখনো এর আসল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ "আল্লাহ সকল দোষ–ত্রুটি মুক্ত।" এখানে এ শব্দটি থেকে এ উভয় অর্থই প্রকাশ হচ্ছে। লোকেরা যে কথা বলছে তার ওপর একদিকে বিস্ময় প্রকাশ করাও যেমন উদ্দেশ্য, তেমনি অন্যদিকে এ মর্মে তাদের জবাব দেয়াও উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তো ত্রুটিমুক্ত, কাজেই তাঁর সন্তান আছে একথা বলা কেমন করে সঠিক হতে পারে।

৬৮. এখানে তাদের এ বক্তব্যের প্রতিবাদে তিনটি কথা বলা হয়েছে। এক, আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত। দুই, তাঁর কোন অভাব নেই, তিনি কারোর মুখাপেক্ষী নন। তিন, আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই তাঁর মালিকানাধীন সামান্য একটু ব্যাখ্যা করলে এ সংক্ষিপ্ত জবাবটি সহজেই অনুধাবন করা যেতে পারে ঃ

পুত্র দুই রকমের হতে পারে। ঔরসজাত অথবা পালিত। তারা যদি কাউকে ঔরসজাত অর্থে আল্লাহর পুত্র গণ্য করে তাহলে এর মানে হবে যে, তারা আল্লাহকে এমন এক জীবের মত মনে করে, যে স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে মরণশীল এবং যার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য তার কোন স্বজাতি থাকতে হবে আবার এ স্বজাতি থেকে তার একজন স্ত্রী হতে হবে এবং তাদের দু'জনের যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে তার সন্তান উৎপন্ন হবে। এ সন্তান তার প্রজাতীয় সত্তা এবং তার কাজ টিকিয়ে রাখবে। এ ছাড়া তার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা হতে পারে না। আর যদি তারা কাউকে দত্তক অর্থে আল্লাহর পুত্র গণ্য করে তাহলে এর দু'টি অর্থ হবে। এক, তারা আল্লাহকে এমন এক মানুষের মতো মনে করে, যে নিসন্তান হবার কারণে নিজের উত্তরাধিকারী করার এবং

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ۘ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم
مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ
وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَأُمِرْتُ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ
وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾

৮ রুকূ'

তাদেরকে নূহের কথা শুনাও।[৬৯] সেই সময়ের কথা যখন সে তার কওমকে বলেছিল, "হে আমার কওমের লোকেরা! যদি তোমাদের মধ্যে আমার অবস্থান ও বসবাস এবং আল্লাহর আয়াত শুনিয়ে শুনিয়ে তোমাদের গাফলতি থেকে জাগিয়ে তোলা তোমাদের কাছে অসহনীয় হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করি, তোমরা নিজেদের তৈরী করা শরীকদের সংগে নিয়ে একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্ত করে নাও এবং তোমাদের সামনে যে পরিকল্পনা আছে সে সম্পর্কে খুব ভালোভাবে চিন্তা করে নাও, যাতে তার কোন একটি দিকও তোমাদের দৃষ্টির আড়ালে না থেকে যায়। তারপর আমার বিরুদ্ধে তাকে সক্রিয় করো এবং আমাকে মোটেই অবকাশ দিয়ো না।[৭০] তোমরা আমার নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো (এতে আমার কি ক্ষতি করেছো), আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনি। আমার প্রতিদান তো আল্লাহর কাছে। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে (কেউ স্বীকার করুক বা না করুক) আমি যেন মুসলিম হিসাবে থাকি।" তারা তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে, ফলে আমি তাকে এবং তার সাথে যারা নৌকায় ছিল সবাইকে রক্ষা করেছি এবং তাদেরকেই পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি আর যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা বলেছিল তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছি। কাজেই যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল (এবং তারপরও তারা মেনে নেয়নি) তাদের পরিণাম কি হয়েছে দেখো।

সন্তানহীনতার দরুন তার যে ক্ষতি হচ্ছে নামমাত্র হলেও তার কিছুটা প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে নিজের প্রজাতির কোন একজনকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে। দুই, তারা মনে করে আল্লাহও মানবিক আবেগের অধিকারী। এ কারণে নিজের অসংখ্য বান্দাদের মধ্য থেকে কোন একজনের প্রতি তার স্নেহ ভালোবাসা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তাকে নিজের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

এ তিনটি অবস্থার যে কোনটিই সঠিক হোক না কেন, সর্বাবস্থায়ই এ বিশ্বাসের মৌল তত্ত্বের মধ্যে আল্লাহর প্রতি আরোপিত হবে বহু দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা ও অভাব। এ কারণে প্রথম বাক্যাংশে বলা হয়েছে তোমরা আল্লাহর ওপর যেসব দোষ, ত্রুটি ও দুর্বলতা আরোপ করছো সেসব থেকে তিনি মুক্ত। দ্বিতীয় বাক্যাংশে বলা হয়েছে, তিনি এমন ধরনের অভাব থেকেও মুক্ত যার কারণে মরণশীল মানুষদের সন্তানের দত্তক নেবার প্রয়োজন হয়। তৃতীয় বাক্যাংশে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে যে, পৃথিবীতে ও আকাশে সবাই আল্লাহর বান্দা ও তাঁর দাস। তাদের কারোর সাথে আল্লাহর এমন কোন বিশেষ বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই যার ফলে সবাইকে বাদ দিয়ে তিনি তাকেই নিজের পুত্র বা একমাত্র পুত্র অথবা উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন। বান্দার গুণের কারণে অবশ্যি আল্লাহ একজনের তুলনায় আর একজনকে বেশী ভালোবাসেন। কিন্তু এ ভালবাসার অর্থ এ নয় যে, কোন বান্দাকে বন্দেগী পর্যায় থেকে উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অংশীদার করার পর্যায়ে উন্নীত করবেন। বড়জোর এ ভালোবাসার দাবী ততটুকুই হতে পারে যা এর আগের একটি আয়াতে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ "যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেছে তাদের কোন ভয় ও মর্মযাতনা নেই। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই তাদের জন্য আছে শুধু সুসংবাদ।"

৬৯. এ পর্যন্ত যে আলোচনা হয়েছে তাতে এ লোকদেরকে ন্যায়সংগত যুক্তি ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশের মাধ্যমে তাদের আকীদা-বিশ্বাস এবং চিন্তা ও পদ্ধতিতে কি কি ভুল-ভ্রান্তি আছে এবং সেগুলো ভুল কেন আর এর মোকাবিলায় সঠিক পথ কি এবং তা সঠিক কেন, একথা বুঝানো হয়েছিল। এই সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট উপদেশের জবাবে তারা যে কর্মনীতি অবলম্বন করছিল আলোচ্য রুকূ'তে সে দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। দশ বারো বছর ধরে তারা এ নীতি অবলম্বন করে আসছিল যে, এ যুক্তিসংগত সমালোচনা ও সঠিক পথপ্রদর্শনের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে নিজেদের ভুল পথ অবলম্বনের ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা না করে উল্টো যে ব্যক্তি নিজের কোন স্বার্থে নয় বরং তাদের ভালোর জন্য একথাগুলো পেশ করছিলেন তার প্রাণনাশে উদ্যোগী হয়। তারা যুক্তির জবাব পাথরের সাহায্যে এবং নসীহতের জবাব গালির সাহায্যে দিয়ে চলছিল। নিজেদের লোকালয়ে এমন ব্যক্তির অস্তিত্ব তাদের কাছে ভয়ানক বিরক্তিকর বরং অসহ্যকর হয়ে উঠেছিল যিনি মিথ্যাকে মিথ্যা বলেন এবং সঠিক কথা বলার চেষ্টা করেন। তাদের দাবী ছিল, আমাদের এ অন্ধদের সমাজে যদি কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি থেকে থাকে তবে সে আমাদের চোখ খুলে দেবার পরিবর্তে তার নিজের চোখও বন্ধ করে রাখুক। নয়তো আমরা জোর করে তার চোখ কানা করে দেবো, যাতে আমাদের দেশে দৃষ্টিশক্তি নামক কোন জিনিস না থাকে। তারা এই যে কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল এ সম্পর্কে আরো কিছু বলার পরিবর্তে আল্লাহ তাঁর নবীকে হুকুম দিচ্ছেন, তাদেরকে নূহের ঘটনা শুনিয়ে দাও, এ ঘটনা থেকেই তারা তোমার ও তাদের মধ্যকার ব্যাপারটির জবাব পেয়ে যাবে।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧٦﴾ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿٧٧﴾

তারপর নূহের পর আমি বিভিন্ন পয়গম্বরকে তাদের কওমের কাছে পাঠাই এবং তারা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তাদের কাছে আসে। কিন্তু যে জিনিসকে তারা আগেই মিথ্যা বলেছিল তাকে আর মেনে নিতে প্রস্তুত হলো না। এভাবে আমি সীমা অতিক্রমকারীদের দিলে মোহর মেরে দেই।[৭১]

তারপর[৭২] *মূসা ও হারুনকে আমি তাদের পরে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার সরদারদের কাছে পাঠাই। কিন্তু তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মত্ত হয়*[৭৩] *এবং তারা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়। পরে যখন আমার কাছ থেকে সত্য তাদের সামনে আসে, তারা বলে দেয়, এ তো সুস্পষ্ট যাদু।*[৭৪] *মূসা বললো, "সত্য যখন তোমাদের সামনে এলো তখন তোমরা তার সম্পর্কে এমন (কথা) বলছো? এ কি যাদু? অথচ যাদুকর সফলকাম হয় না।"*[৭৫]

৭০. এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। বলা হচ্ছে, আমি নিজের কাজ থেকে বিরত হবো না। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যা করতে চাও করো। আমি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখি। (তুলনামূলক পাঠের জন্য দেখুন সূরা হূদের ৫৫ আয়াত)।

৭১. সীমা অতিক্রমকারী লোক তাদেরকে বলে যারা একবার ভুল করার পর আবাব নিজের কথার বক্রতা, একগুঁয়েমী ও হঠকারিতার কারণে নিজের ভুলের ওপর অবিচল থাকে এবং যে কথা মেনে নিতে একবার অস্বীকার করেছে তাকে আর কোন প্রকার উপদেশ, অনুরোধ–উপরোধ ও কোন উন্নত থেকে উন্নত পর্যায়ের যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে মেনে নিতে চায় না। এ ধরনের লোকদের ওপর শেষ পর্যন্ত আল্লাহর এমন লানত পড়ে যে, তাদের আর কোনদিন সঠিক পথে চলার সুযোগ হয় না।

৭২. এ প্রসংগে সূরা আ'রাফের ১৩ থেকে ২১ রুকূ'র মধ্যে মূসা ও ফেরাউনের সংঘাতের ব্যাপারে আমি যে টীকাগুলো দিয়েছি সেগুলো পড়ে দেখা যেতে পারে। সেখানে যেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা করেছি এখানে আর সেগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হবে না।

৭৩. অর্থাৎ সে নিজের বিপুল বৈভব, রাজক্ষমতা ও শান-শওকতের নেশায় মত্ত হয়ে নিজেই নিজেকে ভৃত্যের আসন থেকে ওপরে তুলে নিয়েছে এবং আনুগত্যের শির নত করার পরিবর্তে গর্বোন্নত হয়েছে।

৭৪. অর্থাৎ হযরত মূসার বাণী শুনে তারা সেই একই কথা বলেছিল যা মক্কার কাফেররা বলেছিল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে। কাফেররা বলেছিল, "এ ব্যক্তি তো পাক্কা যাদুকর।" (দেখুন এ সূরা ইউনুসের দ্বিতীয় আয়াত)।

এখানে প্রাসংগিক আলোচনার প্রতি দৃষ্টি রাখলে একথা স্পষ্টই ধরা পড়ে যে, আসলে হযরত নূহ (আ) এবং তাঁর পরে সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী পর্যায়ক্রমে যে দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন হযরত মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালাম সেই একই দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ সূরার শুরু থেকে একই বিষয়বস্তু চলে আসছে। এ বিষয়বস্তুটি হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে নিজের রব ও ইলাহ হিসেবে মেনে নাও। এই সংগে একথা স্বীকার করে নাও যে, এ জীবনের পরে আর একটি জীবন আসছে, সেখানে তোমাদের আল্লাহর সামনে হাযির হতে এবং নিজেদের কাজের হিসাব দিতে হবে। তারপর যারা নবীর এ দাওয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করছিল তাদেরকে বুঝানো হচ্ছে, শুধুমাত্র তোমাদের কল্যাণ নয় বরং সমগ্র বিশ্ব মানবতার কল্যাণ চিরকাল একটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে এসেছে। সে বিষয়টি হচ্ছে, তাওহীদ ও আখেরাত বিশ্বাসের আহবানে সাড়া দেয়া। প্রতি যুগে আল্লাহর নবীগণ এ আহবানই জানিয়েছেন। তাঁরা এ আহবানে সাড়া দিয়ে নিজের সমগ্র জীবন ব্যবস্থাকে এরই ভিত্তিতে কায়েম করার তাগিদ করেছেন। যারা এ কাজ করেছে একমাত্র তারাই কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করেছে। আর যে জাতি একে অস্বীকার করেছে তারা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেছে। এটিই এ সূরার কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়। এ প্রেক্ষাপটে যখন ঐতিহাসিক নজীর হিসেবে অন্যান্য নবীদের প্রসংগ আলোচিত হয়েছে তখন অনিবার্যভাবে এর অর্থ হয়েছে এই যে, এ সূরায় যে দাওয়াত দেয়া হয়েছে সেটিই ছিল সকল নবীর দাওয়াত এবং এ দাওয়াত নিয়েই হযরত মূসা ও হারুনও ফেরাউন ও তার কওমের সরদারদের কাছে গিয়েছিলেন। কোন কোন লোক যেমন মনে করে থাকেন, হযরত মূসা ও হারুনের দায়িত্ব ছিল একটি বিশেষ জাতিকে অন্যান্য জাতির গোলামী থেকে মুক্ত করা। যদি এটিই সত্য হতো তাহলে এ প্রেক্ষাপটে এ ঘটনাটিকে ঐতিহাসিক নজীর হিসেবে পেশ করা একেবারেই বেমানান হতো। নিসন্দেহে বনী ইসরাঈলকে (একটি মুসলিম কওম) একটি কাফের কওমের আধিপত্য (যদি তারা নিজেদের কুফরীর ওপর অটল থাকে) মুক্ত করা এঁদের দু'জনের মিশনের একটি অংশ ছিল। কিন্তু এটি ছিল তাঁদের নবুওয়াতের একটি আনুসংগিক উদ্দেশ্য, মূল উদ্দেশ্য ছিল না। আসল উদ্দেশ্য তা-ই ছিল যা কুরআনের দৃষ্টিতে সকল নবীর নবুওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল এবং সূরা নাযিআতে যে সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে বলে দেয়া হয়েছে ঃ

قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ۭ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾

তারা জবাবে বললো, "তুমি কি যে পথে আমরা আমাদের বাপ–দাদাদের পেয়েছি সে পথ থেকে আমাদের ফিরিয়ে দিতে এবং যাতে যমীনে তোমাদের দু'জনের প্রাধান্য কায়েম হয়ে যায় সে জন্য এসেছো?[৭৬] তোমাদের কথা তো আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত নই।" আর ফেরাউন (নিজের লোকদের) বললো, "সকল দক্ষ ও অভিজ্ঞ যাদুকরকে আমার কাছে হাযির করো।"—যখন যাদুকররা এসে গেলো, মূসা তাদেরকে বললো, "যা কিছু তোমাদের নিক্ষেপ করার আছে নিক্ষেপ করো।" তারপর যখন তারা নিজেদের ভোজবাজি নিক্ষেপ করলো, মূসা বললো, "তোমরা এই যা কিছু নিক্ষেপ করেছো এগুলো যাদু।[৭৭] আল্লাহ এখনই একে ব্যর্থ করে দেবেন। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজকে আল্লাহ সার্থক হতে দেন না। আর অপরাধীদের কাছে যতই বিরক্তিকর হোক না কেন আল্লাহ তাঁর ফরমানের সাহায্যে সত্যকে সত্য করেই দেখিয়ে দেন।"

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ○ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ○ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى –

"ফেরাউনের কাছে যাও, কারণ সে গোলামীর সীমা অতিক্রম করে গেছে এবং তাকে বলো, তুমি কি নিজেকে শুধরে নেবার জন্য তৈরী আছো? আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ দেখাবো, তুমি কি তাঁকে ভয় করবে?"

কিন্তু যেহেতু ফেরাউন ও তার রাজ্যের প্রধানগণ এ দাওয়াত গ্রহণ করেনি এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মূসাকে নিজের মুসলিম কওমকে তার অধীনতার নাগপাশ থেকে বের করে আনতে হয়েছিল। তাই তাঁর মিশনের এ অংশটিই ইতিহাসে প্রাধান্য লাভ করেছে এবং

কুরআনেও একে ঠিক ইতিহাসে যেভাবে আছে তেমনিভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি কুরআনের বিস্তারিত বিবরণগুলোকে তার মৌলিক বক্তব্য থেকে আলাদা করে দেখার মতো ভুল করে না বরং সেগুলোকে সমগ্র বক্তব্যের অধীনেই দেখে থাকে, সে কখনো একটি জাতির দাসত্ব মুক্তিকে কোন নবীর নবুওয়াতের আসল উদ্দেশ্য এবং আল্লাহর সত্য দ্বীনের দাওয়াতকে নিছক তার আনুসংগিক উদ্দেশ্য মনে করার মত বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হতে পারে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা ত্বা-হা ৪৪ থেকে ৫২ আয়াত, যুখরুফ ৪৬ থেকে ৫৬ আয়াত এবং মুয্‌যাম্মিল ১৫ থেকে ১৬ আয়াত)।

৭৫. এর মানে হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে মু'জিযা ও যাদুর মধ্যে যে সাদৃশ্য রয়েছে তার ফলে তোমরা নির্দ্বিধায় তাকে যাদু গণ্য করেছো। কিন্তু মূর্খের দল, তোমরা একটুও ভেবে দেখলে না, যাদুকররা কোন্ ধরনের চরিত্রের অধিকারী হয় এবং তারা কি উদ্দেশ্যে যাদু করে। একজন যাদুকর কি কখনো কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়াই এবং কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই বেধড়ক একজন স্বৈরাচারী শাসকের দরবারে আসে, তাকে তার ভ্রষ্টতার জন্য ধমক দেয় ও তিরস্কার করে এবং তার প্রতি আল্লাহর আনুগত্য করার ও আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করার আহবান জানায়? তোমাদের কাছে কোন যাদুকর এলে প্রথমে রাজ সমক্ষে নিজের তেলেসমাতি দেখাবার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য দরবারের পারিষদবর্গের খোশামোদ করতে থাকতো। তারপর দরবারে প্রবেশ করার সৌভাগ্য হলে সাধারণ তোষামোদকারীদের থেকেও বেশী নির্লজ্জতার সাথে অভিবাদন পেশ করতো, চীৎকার করে করে রাজার দীর্ঘায়ু কামনা করতো, তাঁর সৌভাগ্যের জন্য দোয়া করতো এবং বড়ই কাতর কাকুতি মিনতি সহকারে নিবেদন করতো, হে রাজন! আপনার একজন উৎসর্গীত প্রাণ সেবাদাসের কৃতিত্ব কিছুটা দর্শন করুন। আর তার যাদু দেখে নেবার পর সে পুরস্কার লাভের আশায় নিজের হাত পাততো। এ সমগ্র বিষয়বস্তুটি শুধু একটি মাত্র বাক্যের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে বলা হয়েছে, যাদুকর কোন কল্যাণ প্রাপ্ত লোক হয় না।

৭৬. বনী ইসরাঈলকে উদ্ধার করা যদি হযরত মূসা (আ) ও হারুনের (আ) মূল দাবী হতো তাহলে ফেরাউন ও তার দরবারের লোকদের এ ধরনের আশংকা করার কোন প্রয়োজন ছিল না যে, এ দুই মহান ব্যক্তির দাওয়াত ছড়িয়ে পড়লে সারা মিসরের লোকদের ধর্ম বদলে যাবে এবং দেশে তাদের পরিবর্তে এদের দু'জনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। হযরত মূসা (আ) মিসরবাসীকে আল্লাহর বন্দেগীর প্রতি যে আহবান জানাচ্ছিলেন এটিই তো ছিল তাদের আশংকার কারণ। এর ফলে যে মুশরিকী ব্যবস্থার ওপর ফেরাউনের বাদশাহী, তার সরদারদের নেতৃত্ব এবং ধর্মীয় নেতাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল তা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আ'রাফের ৬৬ এবং সূরা মুমিনের ৪৩ টীকা)।

৭৭. অর্থাৎ আমি যা দেখিয়েছি তা যাদু ছিল না বরং তোমরা এই যা দেখাচ্ছো এ হচ্ছে যাদু।

فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِۦ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

৯ রুকূ'

(তারপর দেখো) মূসাকে তার কওমের কতিপয় নওজোয়ান[৭৮] ছাড়া কেউ মেনে নেয়নি,[৭৯] ফেরাউনের ভয়ে এবং তাদের নিজেদেরই কওমের নেতৃস্থানীয় লোকদের ভয়ে। (তাদের আশংকা ছিল) ফেরাউন তাদের ওপর নির্যাতন চালাবে। আর প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ফেরাউন দুনিয়ায় পরাক্রমশালী ছিল এবং সে এমন লোকদের অন্তরভুক্ত ছিল যারা কোন সীমানা মানে না।[৮০]

মূসা তার কওমকে বললো, "হে লোকেরা! যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহর প্রতি ঈমান রেখে থাকো তাহলে তাঁর ওপর ভরসা করো, যদি তোমরা মুসলিম—আত্মসমর্পণকারী হও।[৮১] তারা জবাব দিল, "আমরা আল্লাহরই ওপর ভরসা করলাম। হে আমাদের রব! আমাদেরকে জালেমদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত করো না[৮২] এবং তোমার রহমতের সাহায্যে কাফেরদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো।"

আর আমি মূসা ও তার ভাইকে ইশারা করলাম এই বলে যে, "মিসরে নিজের কওমের জন্য কতিপয় গৃহের সংস্থান করো, নিজেদের ঐ গৃহগুলোকে কিব্‌লায় পরিণত করো এবং নামায কায়েম করো।[৮৪] আর ঈমানদারদেরকে সুখবর দাও।[৮৫]

৭৮. কুরআনের মূল বাক্যে ذُرِّيَّةٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে সন্তান–সন্ততি। আমি এর অনুবাদ করেছি নওজোয়ান। কিন্তু এ বিশেষ শব্দটির মাধ্যমে কুরআন মজীদ যে কথা

বর্ণনা করতে চায় তা হচ্ছে এই যে, এ বিভীষিকাময় দিনগুলোতে গুটিকয় ছেলেমেয়েই তো সত্যের সাথে সহযোগিতা করার এবং সত্যের পতাকাবাহীকে নিজেদের নেতা হিসেবে মেনে নেয়ার দুঃসাহস করেছিল। কিন্তু মা–মাপ ও জাতির বয়স্ক লোকেরা এ সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনি। তারা তখন বৈষয়িক স্বার্থ পূজা, সুবিধাবাদিতা ও নিরাপদ জীবন যাপনের চিন্তায় এত বেশী বিভোর ছিল যে, এমন কোন সত্যের সাথে সহযোগিতা করতে তারা উদ্যোগী হয়নি যার পথ তারা দেখছিল বিপদসংকুল। বরং তারা উল্টো নওজোয়ানদের পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছিল। তাদেরকে বলছিল, তোমরা মূসার ধারে কাছেও যেয়ো না, অন্যথায় তোমরা নিজেরা ফেরাউনের রোষাগ্নিতে পড়বে এবং আমাদের জন্যও বিপদ ডেকে আনবে।

কুরআনের একথা বিশেষভাবে সুস্পষ্ট করে পেশ করার কারণ হচ্ছে এই যে, মক্কার জনবসতিতেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সহযোগিতা করার জন্য যারা এগিয়ে এসেছিলেন তারাও জাতির বয়স্ক ও বয়োবৃদ্ধ লোক ছিলেন না বরং তারাও সবাই ছিলেন বয়সে নবীন। আলী ইবনে আবী তালেব (রা), জাফর তাইয়ার (রা), যুবাইর (রা), তালহা (রা), সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা), মুসআব ইবনে উমাইর (রা), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মতো লোকদের বয়স ইসলাম গ্রহণের সময় ২০ বছরের কম ছিল। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা), বিলাল (রা) ও সোহাইবের (রা) বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ছিল। আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা) যায়েদ ইবনে হারেসাহ (রা), উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা) ও উমর ফারুকের (রা) বয়স ছিল ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। এদের সবার থেকে বেশী বয়সের ছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা)। তাঁর বয়স ঈমান আনার সময় ৩৮ বছরর বেশী ছিল না। প্রাথমিক মুসলমানদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন সাহাবীর নাম আমরা পাই যাঁর বয়স ছিল নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে বেশী। তিনি ছিলেন হযরত উবাইদাহ ইবনে হারেস মুত্তালাবী (রা)। আর সম্ভবত সাহাবীগণের সমগ্র দলের মধ্যে একমাত্র হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমবয়সী।

৭৯. মূল ইবারতে فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰى শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এতে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেছেন, হয়তো বনী ইসরাঈলের সবাই কাফের ছিল এবং শুরুতে তাদের মধ্য থেকে মাত্র গুটিকয় লোক ঈমান এনেছিল। কিন্তু "ঈমান' শব্দের পরে যখন "লাম" ব্যবহৃত হয় তখন সাধারণত এর অর্থ হয় আনুগত্য ও তাঁবেদারী করা। অর্থাৎ কারোর কথা মেনে নেয়া এবং তার কথায় ওঠাবসা করা। কাজেই মূলত এ শব্দগুলোর ভাবগত অর্থ হচ্ছে, গুটিকয় নওজোয়ানকে বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত বনী ইসরাঈল জাতির কেউই হযরত মূসাকে নিজের নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য করতে এবং ইসলামী দাওয়াতের কাজে তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়নি। তারপর পরবর্তী বাক্যাংশ একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাদের এ কার্যধারার আসল কারণ এ ছিল না যে, হযরত মূসার সত্যবাদী ও তাঁর দাওয়াত সত্য হবার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন সন্দেহ ছিল বরং এর কারণ শুধুমাত্র এই ছিল যে, তারা এবং বিশেষ করে তাদের প্রধান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ হযরত মূসার সহযোগী হয়ে ফেরাউনের নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হবার ঝুঁকি নিতে রাজী ছিল না। যদিও তারা বংশধারা ও ধর্মীয় উভয় দিক দিয়ে হযরত

ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ আলাইহিমুস সালামের উম্মত ছিল এবং এ দিক দিয়ে তারা সবাই মুসলমান ছিল। কিন্তু দীর্ঘকালীন নৈতিক অবক্ষয় এবং পরাধীনতার ফলে সৃষ্ট কাপুরুষতা তাদের মধ্যে কুফরী ও গোমরাহীর শাসনের বিরুদ্ধে ঈমান ও হেদায়াতের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে নিজেরা এগিয়ে আসার অথবা যে এগিয়ে এসেছে তাকে সাহায্য করার মত মনোবল অবশিষ্ট রাখেনি।

হযরত মূসা ও ফেরাউনের এ সংঘাতে সাধারণ বনী ইসরাঈলদের ভূমিকা কি ছিল? একথা বাইবেলের নিম্নোক্ত অংশ থেকে আমরা জানতে পারি।

"পরে ফেরাউনের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় তাহারা মূসার ও হারুনের সাক্ষাত পাইল। তাঁহারা পথে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাহারা তাঁহাদিগকে কহিল, সদাপ্রভু তোমাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিচার করুন ঃ কেননা, তোমরা ফেরাউনের দৃষ্টিতে ও তাহার দাসগণের দৃষ্টিতে আমাদিগকে দুর্গন্ধ স্বরূপ করিয়া আমাদের প্রাণনাশার্থে তাহাদের হস্তে খড়গ দিয়াছ।" (যাত্রা পুস্তক ৫ ঃ ২০-২১)

তালমুদে লেখা হয়েছে, বনী ইসরাঈল মূসা ও হারুন আলাইহিমাস সালামকে বলতো ঃ

"আমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একটি নেকড়ে বাঘ একটি ছাগলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং রাখাল এসে নেকড়ের মুখ থেকে ছাগলটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করলো। তাদের উভয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ছাগলটা টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। ঠিক এভাবেই তোমার ও ফেরাউনের টানাহেঁচড়ায় আমাদের দফা রফা হয়েই যাবে।"

সূরা আরাফে একথাগুলোর দিকে ইংগিত করে বলা হয়েছে ঃ বনী ইসরাঈল হযরত মূসাকে বললো ঃ

أُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا (ايت : ١٢٩)

"তুমি আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি, তুমি আসার পরেও নিপীড়নের শিকার হচ্ছি।"

৮০. মূল ইবারতে مسرفين শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, সীমা অতিক্রমকারী। কিন্তু এ শাব্দিক অনুবাদের সাহায্যে তার আসল প্রাণবস্তু সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। "মুসরিফীন" শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে, এমন সব লোক যারা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যে কোন নিকৃষ্টতম পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করে না। যারা কোন প্রকার জুলুম, নৈতিকতা বিগর্হিত কাজ এবং যে কোন ধরনের পাশবিকতা ও বর্বরতায় লিপ্ত হতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। যারা নিজেদের লালসা ও প্রবৃত্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে। তারা এমন কোন সীমানাই মানে না যেখানে তাদের থেমে যেতে হবে।

৮১. এ ধরনের কথা কখনো কোন কাফের জাতিকে সম্বোধন করে বলা যেতে পারে না। হযরত মূসার এ বক্তব্য পরিষ্কার ঘোষণা করছে যে, সমগ্র বনী ইসরাঈল জাতিই তখন মুসলমান ছিল এবং হযরত মূসা তাদেরকে এ উপদেশ দিচ্ছিলেন যে, তোমরা যদি সত্যিই মুসলমান হয়ে থাকো যেমন তোমরা দাবী করে থাকো তাহলে ফেরাউনের শক্তি দেখে ভয় করো না বরং আল্লাহর শক্তির ওপর আস্থা রাখো।

৮২. যেসব নওজোয়ান মূসা আলাইহিস সালামের সাথে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন এটা ছিল তাদের জবাব। এখানে قَالُوا (তারা বললো) শব্দের মধ্যে 'তারা' সর্বনামটি জাতির বা কওমের সাথে যুক্ত না হয়ে ذُرِّيَّةٌ বা সন্তান সন্ততি তথা নওজোয়ানদের সাথে যুক্ত হয়েছে যেমন পরবর্তী বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে।

৮৩. "আমাদেরকে জালেম লোকদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত করো না"—উক্ত সাচ্চা ঈমানদার নওজোয়ানদের এ দোয়া বড়ই ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যবোধক। গোমরাহির সর্বব্যাপী প্রাধান্য ও আধিপত্যের মধ্যে যখন কিছু লোক সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য কোমর বেঁধে লাগে তখন তারা বিভিন্ন ধরনের জালেমের মুখোমুখি হয়। একদিকে থাকে বাতিলের আসল ধারক ও বাহক। তারা পূর্ণশক্তিতে এ সত্যের আহবায়কদের বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত করতে চায়। দ্বিতীয় দিকে থাকে তথাকথিত সত্যপন্থীদের একটি বেশ বড়সড় দল। তারা সত্যকে মেনে চলার দাবী করে কিন্তু মিথ্যার পরাক্রান্ত শাসন ও দোর্দণ্ড প্রতাপের মোকাবিলায় সত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও সংগ্রামকে অনাবশ্যক বা নির্বুদ্ধিতা মনে করে। সত্যের সাথে তারা যে বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাকে কোন না কোন প্রকারে সঠিক ও বৈধ প্রমাণ করার জন্য তারা চরম প্রচেষ্টা চালায়। এ সংগে উল্টা তাদেরকে মিথ্যার ধারক গণ্য করে নিজেদের বিবেকের মর্মমূলে জমে ওঠা ক্লেশ ও জ্বালা মেটায়। সত্যপন্থীদের সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াতের ফলে তাদের মনের গভীরে, সুস্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে এ ক্লেশ জমে ওঠে। তৃতীয় দিকে থাকে সাধারণ জন মানুষ। তারা নিরপেক্ষভাবে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে থাকে। যার পাল্লা ভারী হয়—সে সত্য হোক বা মিথ্যা—তাদের ভোট শেষ পর্যন্ত তারই পাল্লায় পড়ে। এমতাবস্থায় এ সত্যের আহবায়কদের প্রতিটি ব্যর্থতা বিপদ-আপদ, ভুল-ভ্রান্তি, দুর্বলতা ও দোষ-ক্রটি বাতিল পন্থী বা নিরপেক্ষ বিভিন্ন দলের জন্য বিভিন্নভাবে উৎপীড়ন ও উত্যক্ত করণের সুযোগ ও উপলক্ষ হয়ে দেখা দেয়। তাদেরকে বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত করে দেয়া হলে অথবা তারা যদি পরাজিত হয়ে যায় তাহলে প্রথম দলটি বলে, আমরাই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলাম। যে নির্বোধরা পরাজিত হয়ে গেছে তারা সত্যপন্থী ছিল না। দ্বিতীয় দলটি বলে, দেখলে তো! আমরা না বলেছিলাম, এসব বড় বড় শক্তির সাথে বিবাদ ও সংঘর্ষের ফল নিছক কয়েকটি মূল্যবান প্রাণের বিনাশ ছাড়া আর কিছুই হবে না। শরীয়াত কবেইবা নিজেদেরকে এ ধ্বংসের গর্তে নিক্ষেপ করার দায়-দায়িত্ব আমাদের ওপর চাপিয়েছিল? সমকালীন ফেরাউনেরা তথা স্বৈরাচারী শাসকেরা যেসব ধ্যান-ধারণা পোষণ ও কাজ করার অনুমতি দিয়েছিল তার মাধ্যমেই তো দীনের সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় দাবীগুলো পূরণ হচ্ছিল। তৃতীয় দলটি তার সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেয়, যে বিজয়ী হয়েছে সে-ই সত্য। এভাবে যদি সে তার দাওয়াতের কাজে কোন প্রকার ভুল করে বসে অথবা বিপদ ও সংকটকালে কোন সাহায্য-সহায়তা না পাওয়ার কারণে দুর্বলতা দেখায় কিংবা তার বা তার কোন সদস্যের কোন নৈতিক ক্রটির প্রকাশ ঘটে তাহলে বহু লোকের জন্য মিথ্যার পক্ষাবলম্বনের হাজারো বাহানা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর তারপর এ দাওয়াতের ব্যর্থতার পর সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত সত্যের দাওয়াতের উত্থানের আর কোন সম্ভাবনাই থাকে না। কাজেই মূসা আলাইহিস সালামের সাথীরা যে দোয়া করেছিলেন তা ছিল বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ দোয়া। তারা দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি এমন অনুগ্রহ বর্ষণ করো যাতে আমরা জালেমদের জন্য ফিৎনায় তথা উৎপীড়নের অসহায় শিকারে পরিণত না হই।" অর্থাৎ আমাদের ভুল-ভ্রান্তি, দোষ-ক্রটি ও

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

মূসা দোয়া করলো, "হে আমাদের রব! তুমি ফেরাউন ও তার সরদারদেরকে দুনিয়ার জীবনের শোভা-সৌন্দর্য[৮৭] ও ধন-সম্পদ[৮৮] দান করেছো। হে আমাদের রব! একি এ জন্য যে, তারা মানুষকে তোমার পথ থেকে বিপথে সরিয়ে দেবে? হে আমাদের রব! এদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং এদের অন্তরে এমনভাবে মোহর মেরে দাও যাতে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত যেন এরা ঈমান না আনে।"[৮৯] আল্লাহ জবাবে বললেন, "তোমাদের দু'জনের দোয়া কবুল করা হলো। তোমরা দু'জন অবিচল থাকো এবং মূর্খদের পথ কখনো অনুসরণ করো না।"[৯০]

দুর্বলতা থেকে রক্ষা করো এবং আমাদের প্রচেষ্টাকে দুনিয়ায় ফলদায়ক করো, যাতে আমাদের অস্তিত্ব তোমার সৃষ্টির জন্য কল্যাণপ্রদ হয়, জালেমদের দুরাচারের কারণ না হয়।

৮৪. এ আয়াতটির অর্থের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরদের মধ্যে মতভেদ ঘটেছে। এর শব্দাবলী এবং যে পরিবেশে এ শব্দাবলী উচ্চারিত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করে আমি একথা বুঝেছি যে, সম্ভবত মিসরে সরকারের কঠোর নীতি ও নির্যাতন এবং বনী ইসরাঈলের নিজের দুর্বল ঈমানের কারণে ইসরাঈলী ও মিসরীয় মুসলমানদের মধ্যে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা খতম হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে তাদের ঐক্যগ্রন্থী ছিন্নভিন্ন এবং তাদের দীনী প্রাণসত্তার মৃত্যু ঘটেছিল। এ জন্য এ ব্যবস্থাটিকে নতুন করে কায়েম করার জন্য হযরত মূসাকে হুকুম দেয়া হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল, জামায়াতবদ্ধভাবে নামায পড়ার জন্য মিসরে কয়েকটি গৃহ নির্মাণ করো অথবা গৃহের ব্যবস্থা করে নাও। কারণ একটি বিকৃত ও বিক্ষিপ্ত মুসলিম জাতির দীনী প্রাণসত্তার পুনরুজ্জীবন এবং তার ইতস্তত ছড়ানো শক্তিকে নতুন করে একত্র করার উদ্দেশ্যে ইসলামী পদ্ধতিতে যে কোন প্রচেষ্টাই চালানো হবে তার প্রথম পদক্ষেপেই অনিবার্যভাবে জামায়াতের সাথে নামায কায়েম করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ গৃহগুলোকে কিব্‌লাহ গণ্য করার যে অর্থ আমি বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, এ গৃহগুলোকে সমগ্র জাতির জন্য কেন্দ্রীয় গুরুত্বের অধিকারী এবং তাদের কেন্দ্রীয় সম্মিলন স্থলে পরিণত করতে হবে। আর এরপরই "নামায কায়েম করো" কথাগুলো বলার মানে হচ্ছে এই যে, পৃথক পৃথকভাবে যার যার জায়গায় নামায পড়ে নেয়ার পরিবর্তে লোকদের এ নির্ধারিত স্থানগুলোয় জমায়েত হয়ে নামায পড়তে হবে। কারণ কুরআনের পরিভাষায়

যাকে "ইকামাতে সালাত" বলা হয় জামায়াতের সাথে নামায পড়া অনিবার্যভাবে তার অন্তরভুক্ত রয়েছে।

৮৫. অর্থাৎ বর্তমানে ঈমানদারদের ওপর যে হতাশা, ভীতি–বিহ্বলতা ও নিস্তেজ–নিস্পৃহ ভাব ছেয়ে আছে তা দূর করে দাও। তাদেরকে আশান্বিত করো। তাদেরকে উৎসাহিত ও উদ্যমশীল করো। 'সুখবর দাও' বাক্যাটির মধ্যে এসব অর্থ রয়েছে।

৮৬. ওপরের আয়াতগুলো হযরত মূসার দাওয়াতের প্রথম যুগের সাথে সম্পর্ক রাখে। এ দোয়াটি হচ্ছে মিসরে অবস্থানকালের একেবারে শেষ সময়ের। মাঝখানে কয়েক বছরের দীর্ঘ ব্যবধান। এ সময়কার বিস্তারিত বিবরণ এখানে নেই। তবে কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এ মাঝখানের যুগেরও বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

৮৭. অর্থাৎ আড়ম্বর, শান–শওকত ও সাংস্কৃতিক জীবনের এমন চিত্তাকর্ষক চাকচিক্য, যার কারণে দুনিয়ার মানুষ তাদের ও তাদের রীতি–নীতির মোহে মত্ত হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের পর্যায়ে পৌছার আকাঙ্খা করতে থাকে।

৮৮. অর্থাৎ উপায়–উপকরণ, যেগুলোর প্রাচুর্যের কারণে নিজেদের কলা–কৌশলসমূহ কার্যকর করা তাদের জন্য সহজসাধ্য ছিল এবং যেগুলোর অভাবে সত্যপন্থীরা নিজেদের যাবতীয় কর্মসূচী কার্যকর করতে অক্ষম ছিল।

৮৯. যেমন একটু আগেই আমি বলেছি, এ দোয়াটি হযরত মূসা (আ) করেছিলেন তাঁর মিসরে অবস্থানের একেবারে শেষ সময়ে। এটি তিনি এমন সময় করেছিলেন যখন একের পর এক সকল নিদর্শন দেখে নেবার এবং দীনের সাক্ষ প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যাবার পরও ফেরাউন ও তার রাজসভাসদরা সত্যের বিরোধিতায় চরম হঠকারিতার সাথে অবিচল ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে পয়গম্বর যে বদদোয়া করেন তা কুফরীর ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে হঠকারিতার ভূমিকা অবলম্বনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহর নিজের ফায়সালারই অনুরূপ হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাদেরকে আর ঈমান আনার সুযোগ দেয়া হয় না।

৯০. যারা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত নয় এবং আল্লাহর মহৎ উদ্দেশ্য ও মানব কল্যাণ নীতি বুঝে না, তারা মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যের দুর্বলতা, সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টাকারীদের অনবরত ব্যর্থতা এবং বাতিল মতাদর্শের নেতৃবৃন্দের বাহ্যিক আড়ম্বর, ঐশ্বর্য ও তাদের পার্থিব সাফল্য দেখে ধারণা করতে থাকে, হয়তো মহান আল্লাহ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণকারীদেরকে এ দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্বশীল দেখতে চান। তারা মনে করে, হয়তো আল্লাহ স্বয়ং মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যকে সমর্থন করতে চান না, তারপর এ মূর্খের দল শেষ পর্যন্ত নিজেদের বিভ্রান্তিকর অনুমানের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে পৌছে যে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম আসলে অর্থহীন এবং এ অবস্থায় কুফরী ও ফাসেকী শাসনের আওতায় দীনের পথে চলার যে সামান্যতম অনুমতিটুকু পাওয়া যাচ্ছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এ আয়াতে মহান আল্লাহ হযরত মূসা ও তাঁর অনুসারীদেরকে এ ভ্রান্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করার তাগিদ করেছেন। এখানে আল্লাহর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সবরের সাথে নিজেদের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করে যাও। সাধারণত মূর্খ ও অজ্ঞরা এ ধরনের অবস্থায় যে বিভ্রান্তির শিকার হয় তোমরাও যেন তেমনি বিভ্রান্ত না হও।

وَجٰوَزْنَا بِبَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْیًا وَّعَدْوًا ؕ حَتّٰٓی اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِیْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝٩٠ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ ۝٩١ فَالْیَوْمَ نُنَجِّیْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰیَةً ؕ وَاِنَّ كَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰیٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ۝٩٢

আর আমি বনী ইসরাঈলকে সাগর পার করে নিয়ে গেলাম। তারপর ফেরাউন ও তার সেনাদল জুলুম–নির্যাতন ও সীমালংঘন করার উদ্দেশ্যে তাদের পেছনে চললো। অবশেষে যখন ফেরাউন ডুবতে থাকলো তখন বলে উঠলো, "আমি মেনে নিলাম, বনী ইসরাঈল যার ওপর ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই এবং আমিও আনুগত্যের শির নতকারীদের অন্তরভুক্ত।[৯১] (জবাব দেয়া হলো) "এখন ঈমান আনছো! অথচ এর আগে পর্যন্ত তুমি নাফরমানী চালিয়ে এসেছো এবং তুমি বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের একজন ছিলে। এখন তো আমি কেবল তোমার লাশটাকেই রক্ষা করবো যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন হয়ে থাকো।[৯২] যদিও অনেক মানুষ এমন আছে যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে উদাসীন।"[৯৩]

৯১. বাইবেলে এ ঘটনার কোন উল্লেখ নেই। তবে তালমূদে বলা হয়েছে, ডুবে যাওয়ার সময় ফেরাউন বলেছিল ঃ "আমি তোমার ওপর ঈমান আনছি। হে প্রভু! তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।"

৯২. সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম সাগর তীরে যেখানে ফেরাউনের লাশ সাগরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল আজো সে জায়গাটি অপরিবর্তিত রয়েছে। বর্তমান সময়ে এ জায়গাটির নাম জাবালে ফেরাউন বা ফেরাউন পর্বত। এরি কাছাকাছি আছে একটি গরম পানির ঝরণা। স্থানীয় লোকেরা এর নাম দিয়েছে হাম্মামে ফেরাউন। এর অবস্থান স্থল হচ্ছে আবু যানীমার কয়েক মাইল ওপরে উত্তরের দিকে। স্থানীয় লোকেরা এ জায়গাটি চিহ্নিত করে বলে, ফেরাউনের লাশ এখানে পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

এ ডুবন্ত ব্যক্তি যদি মিনফাতাহ ফেরাউন হয়ে থাকে, যাকে আধুনিক গবেষণায় মূসার আমলের ফেরাউন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাহলে এর লাশ এখনো কায়রোর যাদু ঘরে রয়েছে। ১৯০৭ সালে স্যার গ্রাফটিন এলিট স্মিথ তার মমির ওপর থেকে যখন পট্টি খুলেছিলেন তখন তার লাশের ওপর লবনের একটি স্তর জমাটবাঁধা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। এটি লবণাক্ত পানিতে তার ডুবে যাওয়ার একটি সুস্পষ্ট আলামত ছিল।

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٩٥﴾

১০ রুকূ'

বনী ইসরাঈলকে আমি খুব ভালো আবাসভূমি দিয়েছি[৯৪] এবং অতি উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ তাদেরকে দান করেছি। তারপর যখন তাদের কাছে জ্ঞান এসে গেলো, তখনই তারা পরস্পরে মতভেদ করলো[৯৫] নিশ্চয়ই তোমার রব কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেই জিনিসের ফায়সালা করে দেবেন, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত ছিল।

এখন যদি তোমার সেই হিদায়াতের ব্যাপারে সামান্যও সন্দেহ থেকে থাকে যা আমি তোমার ওপর নাযিল করেছি তাহলে যারা আগে থেকেই কিতাব পড়ছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে নাও। প্রকৃতপক্ষে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে এ কিতাব মহাসত্য হয়েই এসেছে। কাজেই তুমি সন্দেহকারীদের অন্তরভুক্ত হয়ো না এবং যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছে তাদের মধ্যেও শামিল হয়ো না, তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে।[৯৬]

৯৩. অর্থাৎ আমি তো শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক নিদর্শনসমূহ দেখিয়েই যেতে থাকবো, যদিও বেশীর ভাগ লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, বড় বড় শিক্ষণীয় নিদর্শন দেখেও তাদের চোখ খোলে না।

৯৪. অর্থাৎ মিসর থেকে বের হবার পর ফিলিস্তিন।

৯৫. এর অর্থ হচ্ছে, পরবর্তী পর্যায়ে তারা নিজেদের দীনের মধ্যে যে দলাদলি শুরু করে এবং নতুন নতুন মাযহাব তথা ধর্মীয় চিন্তাগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটায় তার কারণ এ ছিল না যে, তারা প্রকৃত সত্য জানতো না এবং এ না জানার কারণে তারা বাধ্য হয়ে এমনটি করে। বরং আসলে এসব কিছুই ছিল তাদের দুর্বৃত্তসুলভ চরিত্রের ফসল। আল্লাহর পক্ষ থেকে

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

আসলে যাদের ব্যাপারে তোমার রবের কথা সত্য সাব্যস্ত হয়েছে[৯৭] তাদের সামনে যতই নিদর্শন এসে যাক না কেন তারা কখনই ঈমান আনবে না যতক্ষণ না যন্ত্রণাদায়ক আযাব চাক্ষুস দেখে নেবে। এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে কি যে, একটি জনবসতি চাক্ষুস আযাব দেখে ঈমান এনেছে এবং তার ঈমান তার জন্য সুফলদায়ক প্রমাণিত হয়েছে? ইউনুসের কওম ছাড়া[৯৮] (এর কোন নজির নেই) তারা যখন ঈমান এনেছিল তখন অবশ্যি আমি তাদের ওপর থেকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনার আযাব হটিয়ে দিয়েছিলাম[৯৯] এবং তাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছিলাম।[১০০] যদি তোমার রবের ইচ্ছা হতো (যে, যমীনে সবাই হবে মুমিন ও অনুগত) তাহলে সারা দুনিয়াবাসী ঈমান আনতো।[১০১] তবে কি তুমি মুমিন হবার জন্য লোকদের ওপর জবরদস্তি করবে?[১০২] আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউই ঈমান আনতে পারে না।[১০৩] আর আল্লাহর রীতি হচ্ছে, যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না তাদের ওপর কলুষতা চাপিয়ে দেন।[১০৪]

তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছিল ঃ এ হচ্ছে সত্য দীন, এ হচ্ছে তার মূলনীতি, এগুলো—এর দাবী ও চাহিদা, এগুলো হচ্ছে কুফর ও ইসলামের পার্থক্য সীমা, একে বলে আনুগত্য। আর এর নাম হচ্ছে গোনাহ, এসব জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং এসব নিয়মনীতির ভিত্তিতে দুনিয়ায় তোমার জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিন্তু এ সুস্পষ্ট হেদায়াত সত্ত্বেও তারা একটি দীনকে অসংখ্য দীনে পরিণত করে এবং আল্লাহর দেয়া বুনিয়াদগুলো বাদ দিয়ে অন্য বুনিয়াদের ওপর নিজেদের ধর্মীয় ফেরকার প্রাসাদ নির্মাণ করে।

৯৬. বাহ্যত এ সম্বোধনটা করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। কিন্তু আসলে যারা তাঁর দাওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছিল তাদেরকে শুনানোই মূল

উদ্দেশ্য। এ সংগে আহলি কিতাবদের উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরবের সাধারণ মানুষ যথার্থই আসমানী কিতাবের জ্ঞানের সাথে মোটেই পরিচিত ছিল না। তাদের জন্য এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ নতুন আওয়াজ। কিন্তু আহলি কিতাবদের আলেমদের মধ্যে যারা ধর্মভীরু ও ন্যায়নিষ্ঠ মননশীলতার অধিকারী ছিলেন তারা একথার সত্যতার সাক্ষ্য দিতে পারতেন যে, কুরআন যে জিনিসটির দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে পূর্ববর্তী যুগের সকল নবী তারই দাওয়াত দিয়ে এসেছেন।

৯৭. সে কথাটি হচ্ছে এই যে, যারা নিজেরাই সত্যের অন্বেষী হয় না এবং যারা নিজেদের মনের দুয়ারে জিদ, হঠকারিতা, অন্ধগোষ্ঠী প্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থ-বিদ্বেষের তালা ঝুলিয়ে রাখে আর যারা দুনিয়া প্রেমে বিভোর হয়ে পরিণামের কথা চিন্তাই করে না তারাই ঈমান লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

৯৮. ইউনুস আলাইহিস সালাম (যাঁকে বাইবেলে যোনা নামে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাঁর সময়কাল খৃষ্টপূর্ব ৮৬০ থেকে ৭৮৪ সালের মাঝামাঝি সময় বলা হয়ে থাকে) যদিও বনী ইসরাঈলী নবী ছিলেন তবুও তাঁকে আসিরিয়াবাসীদের হেদায়াতের জন্য ইরাকে পাঠানো হয়েছিল। এ কারণে আসিরীয়দেরকে এখানে ইউনুসের কওম বলা হয়েছে। সে সময় এ কওমের কেন্দ্র ছিল ইতিহাস খ্যাত নিনোভা নগরী। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান। দাজলা নদীর পূর্ব তীরে আজকের মুসেল শহরের ঠিক বিপরীত দিকে এ ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ এলাকায় ইউনুস নবী নামে একটি স্থান আজো বর্তমান রয়েছে। এ জাতির রাজধানী নগরী নিনোভা প্রায় ৬০ মাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত ছিল। এ থেকে এদের জাতীয় উন্নতির বিষয়টি অনুমান করা যেতে পারে।

৯৯. কুরআনে এ ঘটনার দিকে তিন জায়গায় শুধুমাত্র ইংগিত করা হয়েছে। কোন বিস্তারিত বিবরণ সেখানে দেয়া হয়নি। (দেখুন আম্বিয়া ৮৭-৮৮ আয়াত, আস্ সাফ্ফাত ১৩৯-১৪৮ আয়াত ও আল কলম ৪৮-৫০ আয়াত) তাই "আযাবের ফায়সালা হয়ে যাবার পর কারোর ঈমান আনা তার জন্য উপকারী হয় না।" আল্লাহ তার এ আইন থেকে হযরত ইউনুসের কওমকে কোন্ কোন্ কারণে নিষ্কৃতি দেন তা নিশ্চয়তার সাথে বলা সম্ভব নয়। বাইবেলে "যোনা ভাববাদীর পুস্তক" নাম দিয়ে যে সংক্ষিপ্ত সহীফা লিপিবদ্ধ হয়েছে তাতে কিছু বিবরণ পাওয়া গেলেও বিভিন্ন কারণে তা নির্ভরযোগ্য নয়। প্রথমত তা আসমানী সহীফা নয় এবং ইউনুস আলাইহিস সালামের লেখাও নয়। বরং তাঁর তিরোধানের চার পাঁচশো বছর পর কোন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ইউনুসের ইতিহাস হিসেবে লিখে এটিকে পবিত্র গ্রন্থসমূহের অন্তরভুক্ত করেন। দ্বিতীয়ত এর মধ্যে কতক একেবারেই আজেবাজে কথাও পাওয়া যায়। এগুলো মেনে নেবার মত নয়। তবুও কুরআনের ইশারা ও ইউনুসের সহীফার বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে কুরআনের তাফসীরকারগণ যে কথা বলেছেন তাই সঠিক বলে মনে হয়। তারা বলেছেন, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম যেহেতু আযাবের ঘোষণা দেবার পর আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই নিজের আবাসস্থল ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন তাই আযাবের লক্ষণ দেখে যখন আসিরীয়রা তওবা করলো এবং গোনাহের জন্য ক্ষমা চাইলো তখন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। কুরআন মজীদে আল্লাহর বিধানের যে মৌল নিয়ম-কানুন বর্ণনা করা হয়েছে তার একটি স্বতন্ত্র ধারা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ কোন

জাতিকে ততক্ষণ আযাব দেন না যতক্ষণ না পূর্ণাঙ্গ দলীল–প্রমাণ সহকারে সত্যকে তাদের সামনে সুস্পষ্ট করে তোলেন। কাজেই নবী যখন সংশ্লিষ্ট জাতির জন্য নির্ধারিত অবকাশের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উপদেশ বিতরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারেননি এবং আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের আগেই নিজ দায়িত্বে হিজরাত করে চলে গেছেন তখন আল্লাহর সুবিচার নীতি এ জাতিকে আযাব দেয়া সমীচীন মনে করেনি। কারণ তার কাছে পূর্ণাঙ্গ দলীল–প্রমাণ সহকারে সত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার আইনগত শর্তাবলী পূর্ণ হতে পারেনি। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন সূরা আস্ সাফ্‌ফাত–এর ব্যাখ্যা ৮৫ টীকা)।

১০০. ঈমান আনার পর এ জাতিটির আয়ু বাড়িয়ে দেয়া হলো। পরে তারা আবার চিন্তা ও কাজের ক্ষেত্রে ভুল পথে পা বাড়ানো শুরু করলো। নাহোম নবী (খৃষ্টপূর্ব ৭২০–৬৯৮) এ সময় তাদেরকে সতর্ক করলেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হলো না। তারপর সফনীয় নবীও (খৃষ্টপূর্ব ৬৪০–৬০৯) তাদেরকে শেষবারের মত সতর্ক করলেন। তাও কার্যকর হলো না। শেষ পর্যন্ত ৬১২ খৃষ্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে আল্লাহ তাদের ওপর মিডিয়াবাসীদের আগ্রাসন সংঘটিত করালেন। মিডিয়ার বাদশাহ ব্যাবিলনবাসীদের সহায়তায় আসিরিয়া এলাকা আক্রমণ করলেন। আসিরীয় সেনাদল পরাজিত হয়ে রাজধানী নিনোভায় অন্তরীণ হলো। কিছুকাল পর্যন্ত তারা জোরেশোরে মোকাবিলা করলো। তারপর দাজলায় এলো বন্যা। এ বন্যায় নগর প্রাচীর ধ্বসে পড়লো। সংগে সংগে আক্রমণকারীরা নগরে প্রবেশ করলো এবং পুরো শহর জ্বালিয়ে ভস্ম করলো। আশপাশের এলাকারও একই দশা হলো। আসিরীয়ার বাদশাও নিজের মহলে আগুন লাগিয়ে তাতে পুড়ে মরলো। আর এ সাথে আসিরীয় রাজত্ব ও সভ্যতারও ইতি ঘটলো চিরকালের জন্য। আধুনিক কালে এ এলাকায় প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খননের যে প্রচেষ্টা চলেছে, তাতে এখানে অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট দেখা গেছে।

১০১. অর্থাৎ আল্লাহ যদি চাইতেন যে, এ পৃথিবীতে শুধুমাত্র তাঁর আদেশ পালনকারী অনুগতরাই বাস করবে এবং কুফরী ও নাফরমানীর কোন অস্তিত্বই থাকবে না তাহলে তাঁর জন্য সারা দুনিয়াবাসীকে মুমিন ও অনুগত বানানো কঠিন ছিল না এবং নিজের একটি মাত্র সৃজনী ইংগিতের মাধ্যমে তাদের অন্তর ঈমান ও আনুগত্যে ভরে তোলাও তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু মানব জাতিকে সৃষ্টি করার পেছনে তাঁর যে প্রজ্ঞাময় উদ্দেশ্য কাজ করছে এ প্রাকৃতিক বল প্রয়োগে তা বিনষ্ট হয়ে যেতো। তাই আল্লাহ নিজেই ঈমান আনা বা না আনা এবং আনুগত্য করা বা না করার ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীন রাখতে চান।

১০২. এর অর্থ এ নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে জোর করে মুমিন বানাতে চাচ্ছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে এমনটি করতে বাধা দিচ্ছিলেন। আসলে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আমরা যে বর্ণনা পদ্ধতি পাই এ বাক্যেও সেই একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। সেখানে আমরা দেখি, সম্বোধন করা হয়েছে বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিন্তু আসলে নবীকে সম্বোধন করে যে কথা বলা হয় তা লোকদেরকে শুনানোই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এখানে যা কিছু বলতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, হে লোকেরা! যুক্তি–প্রমাণের সাহায্যে হেদায়াত ও গোমরাহীর পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলে ধরার এবং সঠিক পথ পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেবার যে দায়িত্ব ছিল তা আমার নবী পুরাপুরি পালন করেছেন। এখন যদি তোমরা নিজেরাই সঠিক পথে চলতে না চাও

قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ؕ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٠١﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

তাদেরকে বলো, "পৃথিবী ও আকাশে যা কিছু আছে চোখ মেলে দেখো।" আর যারা ঈমান আনতেই চায় না তাদের জন্য নিদর্শন ও উপদেশ–তিরস্কার কীইবা উপকারে আসতে পারে।[১০৫] এখন তারা এছাড়া আর কিসের প্রতীক্ষায় আছে যে, তাদের আগে চলে যাওয়া লোকেরা যে দুঃসময় দেখেছে তারাও তাই দেখবে? তাদেরকে বলো, "ঠিক আছে, অপেক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।" তারপর (যখন এমন সময় আসে তখন) আমি নিজের রসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে রক্ষা করি। এটিই আমার রীতি। মুমিনদের রক্ষা করা আমার দায়িত্ব।

এবং তোমাদের সঠিক পথে চলা যদি এর ওপর নির্ভরশীল হয় যে, কেউ তোমাদের ধরে বেঁধে সঠিক পথে চালাবে, তাহলে তোমাদের জেনে রাখা উচিত, নবীকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়নি। এভাবে জবরদস্তি ঈমান আনা যদি আল্লাহর অভিপ্রেত হতো তাহলে এ জন্য নবী পাঠাবার কি প্রয়োজন ছিল? এ কাজ তো তিনি নিজেই যখন ইচ্ছা করতে পারতেন।

১০৩. অর্থাৎ সমস্ত নিয়ামত যেমন আল্লাহর একচ্ছত্র মালিকানাধীন এবং আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন ব্যক্তি কোন নেয়ামতও নিজে লাভ করতে বা অন্যকে দান করতে পারে না ঠিক তেমনিভাবে এ ঈমানের নিয়ামতও আল্লাহর একচ্ছত্র মালিকানাধীন। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ঈমানদার হওয়া এবং তার সত্য–সঠিক পথের সন্ধান লাভ করাও আল্লাহর অনুমতির ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন ব্যক্তি এ নিয়ামতটি নিজে লাভ করতে পারে না এবং কোন মানুষ ইচ্ছা করলে কাউকে এ নিয়ামতটি দান করতেও পারে না। কাজেই নবী যদি লোকদেরকে মুমিন বানাবার জন্য একান্ত আন্তরিকভাবে কামনাও করেন তাহলেও তাঁর জন্য আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর পক্ষ থেকে এ কাজের জন্য সুযোগ দানেরও প্রয়োজন হয়।

১০৪. এখানে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, আল্লাহর অনুমতি ও তাঁর সুযোগ দান অন্ধভাবে বিচার–বিবেচনা ছাড়াই সম্পন্ন হয় না। কোন রকম মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়া এবং কোন প্রকার যুক্তিসংগত নিয়ম–কানুন ছাড়াই যেভাবে ইচ্ছা এবং যাকে ইচ্ছা এ নিয়ামতটি লাভ করার সুযোগ দেয়াও হয় না এবং যাকে ইচ্ছা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিতও করা হয় না। বরং এর একটি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ নিয়ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি সত্যের সন্ধানে নিজের

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّ مِّن دِينِى فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾

১১ রুকূ'

হে নবী! বলে দাও,[১০৬] "হে লোকেরা! যদি তোমরা এখনো পর্যন্ত আমার দীনের ব্যাপারে কোন সন্দেহের মধ্যে থাকো তাহলে শুনে রাখো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের বন্দেগী করো আমি তাদের বন্দেগী করি না বরং আমি কেবলমাত্র এমন আল্লাহর বন্দেগী করি যার করতলে রয়েছে তোমাদের মৃত্যু।[১০৭] আমাকে মুমিনদের অন্তরভুক্ত হবার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে। আর আমাকে বলা হয়েছে, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ঠিকভাবে এ দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করো[১০৮] এবং কখখনো মুশরিকদের অন্তরভুক্ত হয়ো না।[১০৯] আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কোন সত্তাকে ডেকো না, যে তোমার না কোন উপকার করতে না ক্ষতি করতে পারে। যদি তুমি এমনটি করো তাহলে জালেমদের দলভুক্ত হবে।

বুদ্ধিবৃত্তিকে নির্দ্বিধায় যথাযথভাবে ব্যবহার করে তার জন্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যে পৌঁছে যাবার কার্যকারণ ও উপায়–উপকরণ তার নিজের প্রচেষ্টা ও চাহিদার অনুপাতে সরবরাহ করে দেয়া হয় এবং তাকেই সঠিক জ্ঞান লাভ করার ও ঈমান আনার সুযোগ দান করা হয়। আর যারা সত্যসন্ধই নয় এবং নিজেদের বুদ্ধিকে অন্ধগোষ্ঠী প্রীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থ–বিদ্বেষের ফাঁদে আটকে রাখে অথবা আদৌ তাকে সত্যের সন্ধানে ব্যবহারই করে না তাদের জন্য আল্লাহর নিয়তির ভাণ্ডারে মূর্খতা, অজ্ঞতা, ভ্রষ্টতা, ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টি ও ত্রুটিপূর্ণ কর্মের আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা নিজেদেরকে এ ধরনের আবর্জনা ও অপবিত্রতার যোগ্য করে এবং এটিই হয়ে যায় তাদের নিয়তির লিখন।

১০৫. ঈমান আনার জন্য তারা যে দাবীটিকে শর্ত হিসেবে পেশ করতো এটি হচ্ছে তার শেষ ও চূড়ান্ত জবাব। তাদের এ দাবীটি ছিল, আমাদের এমন কোন নিদর্শন দেখাও যার ফলে তোমার নবুওয়াতকে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারি। এর জবাবে বলা হচ্ছে, যদি তোমাদের মধ্যে সত্যের আকাংখা এবং সত্য গ্রহণ করার আগ্রহ থাকে তাহলে পৃথিবী ও আকাশের চারদিকে যে অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে এগুলো মুহাম্মাদের

বাণীর সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের নিশ্চিন্ত করার জন্য শুধু যথেষ্ট নয় বরং তার চাইতেও বেশী। শুধুমাত্র চোখ খুলে সেগুলো দেখার প্রয়োজন। কিন্তু যদি এ চাহিদা ও আগ্রহই তোমাদের মধ্যে না থাকে, তাহলে অন্য কোন নিদর্শন, তা যতই অলৌকিক, অটল ও চিরন্তন রীতি ভংগকারী এবং বিস্ময়কর ও অত্যাশ্চর্য হোক না কেন, তোমাদেরকে ঈমানের নিয়ামত দান করতে পারে না। প্রত্যেকটি মু'জিযা দেখে তোমরা ফেরাউন ও তার কওমের সরদারদের মতই বলবে, এ তো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। এ রোগে যারা আক্রান্ত হয় তাদের চোখ কেবলমাত্র তখনই খুলে থাকে যখন ক্রোধ, রোষবহ্নি ও গযব তার বিভীষিকাময় কঠোরতা সহকারে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঠিক এমনিভাবে ডুবে যাবার সময় ফেরাউনের চোখ খুলেছিল। কিন্তু একেবারে পাকড়াও করার সময় শেষ মুহূর্তে যে তওবা করা হয় তার কোন দাম নেই।

১০৬. যে বক্তব্য দিয়ে ভাষণ শুরু করা হয়েছিল এখন আবার তারই মাধ্যমে ভাষণ শেষ করা হচ্ছে। তুলনামূলক পাঠের জন্য প্রথম রুকূ'র আলোচনার ওপর আর একবার নজর বুলিয়ে নিন।

১০৭. মূল আয়াতে يَتَوَفّٰكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ হচ্ছে "যিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন।" কিন্তু এ শাব্দিক অনুবাদ থেকে আসল মর্মবাণীর প্রকাশ হয় না। এ উক্তির মর্মবাণী হচ্ছে এই যে, "তোমাদের প্রাণ যে সত্তার করতলগত, যিনি তোমাদের ওপর এমনই পূর্ণাঙ্গ শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী যে, যতক্ষণ তিনি ইচ্ছা করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জীবনী শক্তি লাভ করতে পারো এবং তাঁর ইশারা হবার সাথে সাথেই তোমাদের নিজেদের প্রাণ সেই প্রাণ স্রষ্টার হাতে সোপর্দ করে দিতে হয়, আমি কেবলমাত্র সেই সত্তারই উপাসনা, বন্দেগী ও দাসত্ব এবং আনুগত্য করার ও হুকুম মেনে চলার কথা বলি। এখানে আরো একটি কথা বুঝে নিতে হবে। মক্কার মুশরিকরা একথা মানতো এবং আজো সকল শ্রেণীর মুশরিকরা একথা স্বীকার করে যে, মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইখতিয়ারাধীন। এর ওপর অন্য কারো নিয়ন্ত্রণ নেই। এমনকি এ মুশরিকরা যেসব মনীষীকে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতায় শরীক করে তাদের কেউই যে তাদের মৃত্যুর সময় পিছিয়ে দিতে পারেনি, তাদের ব্যাপারে একথাও তারা স্বীকার করে। কাজেই বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আল্লাহর অসংখ্য গুণাবলীর মধ্য থেকে অন্য কোন গুণের কথা বর্ণনা করার পরিবর্তে এ বিশেষ গুণটি যে, "যিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন" এখানে বর্ণনা করার জন্য এ উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা হয়েছে যে, নিজের দৃষ্টিভংগী বর্ণনা করার সাথে সাথে তার সঠিক হওয়ার যুক্তিও এর মাধ্যমে এসে যাবে। অর্থাৎ সবাইকে বাদ দিয়ে আমি একমাত্র তাঁর বন্দেগী করি এ জন্য যে, জীবন ও মৃত্যুর ওপর একমাত্র তাঁরই কর্তৃত্ব রয়েছে। আর তাঁর ছাড়া অন্যের বন্দেগী করবোই বা কেন, তারা তো অন্য কারোর জীবন-মৃত্যু তো দূরের কথা খোদ তাদের নিজেদেরই জীবন-মৃত্যুর ওপর কোন কর্তৃত্ব রাখে না। তাছাড়া আলংকারিক মাধুর্যকেও এখানে এভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে যে, "তিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন" না বলে বলা হয়েছে, "তিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন।" এভাবে একটি বাক্যের সাহায্যে মূল বক্তব্য বিষয়, বক্তব্যের স্বপক্ষের যুক্তি এবং বক্তব্যের প্রতি আহবান তিনটিই সম্পন্ন করা হয়েছে। যদি বলা হতো, "আমি এমন সত্তার বন্দেগী করি যিনি আমাকে মৃত্যু দান

করবেন" তাহলে এর অর্থ কেবল এতটুকুই হতো যে, "আমার তাঁর বন্দেগী করা উচিত।" তবে এখন যে কথা বলা হয়েছে যে, "আমি এমন এক সত্তার বন্দেগী করি যিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন",—এর অর্থ হবে, শুধু আমারই নয় তোমাদেরও তাঁর বন্দেগী করা উচিত আর তোমরা তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী করে ভুল করে যাচ্ছো।

১০৮. এ দাবী কত জোরালো, তা গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। বক্তব্য এভাবেও বলা যেতো, "তুমি এ দীন অবলম্বন করো" অথবা "এ দীনের পথে চলো" কিংবা "এ দীনের অনুগত ও অনুসারী হয়ে যাও।" কিন্তু মহান আল্লাহ এ বর্ণনাভংগীকে ঢিলেঢালা সাব্যস্ত করেছেন। এ দীন যেমন অবিচল ও তেজোদ্দীপ্ত আনুগত্য চায় এ দুর্বল শব্দসমূহের সাহায্যে তা প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। তাই নিজের দাবী তিনি নিম্নোক্ত শব্দাবলীর মাধ্যমে পেশ করেছেন ঃ

اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا

এখানে اقم وجهك এর শাব্দিক মানে হচ্ছে, "নিজের চেহারাকে স্থির করে দাও।" এর অর্থ, তুমি একই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকো। নড়াচড়া করো না এবং এদিক ওদিক ফিরো না। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে মুড়ে যেয়ো না। একেবারে নাক বরাবর সোজা পথে দৃষ্টি রেখে চলো, যেপথ তোমাকে দেখানো হয়েছে। এটি বড়ই শক্ত বাঁধন ছিল। কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত থাকা হয়নি। এর ওপর আরো একটু বাড়তি বাঁধন দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে حنيفا অর্থাৎ সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র একদিকে মুখ করে থাকো। কাজেই দাবী হচ্ছে, এ দীন, আল্লাহর বন্দেগীর এ পদ্ধতি এবং জীবন যাপন প্রণালীর ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনের উপাসনা–আরাধনা, ইবাদাত–বন্দেগী, দাসত্ব, আনুগত্য করতে ও হুকুম মেনে চলতে হবে। এমন একনিষ্ঠভাবে করতে হবে যে, অন্য কোন পদ্ধতির দিকে সামান্যতম ঝুঁকে পড়াও যাবে না। যেসব পথ তুমি ইতিপূর্বে পরিত্যাগ করে এসেছো এ পথে এসে সেই ভুল পথগুলোর সাথে সামান্যতম সম্পর্কও রাখবে না এবং দুনিয়ার মানুষ যেসব বাঁকা পথে চলেছে সেসব পথের দিকে একবার ভুল করেও তাকাবে না।

১০৯. অর্থাৎ যারা আল্লাহর সত্তা, তাঁর গুণাবলী, অধিকার ও ক্ষমতা–ইখতিয়ারে কোনভাবে অন্য কাউকে শরীক করে কখখনো তাদের অন্তরভুক্ত হয়ো না। এ অন্য কেউ তারা নিজেরাও হতে পারে আবার অন্য কোন মানুষ, মানব গোষ্ঠী, কোন আত্মা, জিন, ফেরেশতা অথবা কোন বস্তুগত, কাল্পনিক বা আনুমানিক সত্তাও হতে পারে। কাজেই পূর্ণ অবিচলতা সহকারে নির্ভেজাল তাওহীদের পথ অনুসরণ করার মত ইতিবাচক পদ্ধতির মধ্যেই শুধু দাবীকে আটকে রাখা হয়নি। বরং নেতিবাচক অবস্থার ক্ষেত্রে এমনসব লোকের থেকে আলাদা হয়ে যাবার দাবী জানানো হয়েছে যারা কোন না কোন প্রকারে শিরক করে থাকে। শুধু আকীদা–বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই নয় কাজে–কর্মে ও ব্যক্তি জীবন ধারায়ই নয় সামষ্টিক জীবন বিধানের ক্ষেত্রেও, ইবাদাতগাহ ও উপাসনালয়েই নয় শিক্ষায়তনেও, আদালত গৃহে, আইন প্রণয়ন পরিষদে, রাজনৈতিক মঞ্চে, অর্থনৈতিক বাজারে সর্বত্রই যারা নিজেদের চিন্তা ও কর্মের সমগ্র ব্যবস্থাই আল্লাহর আনুগত্য ও গায়রুল্লাহর আনুগত্যের মিশ্রণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। সব জায়গায়ই তাদের

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ
فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا
يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

যদি আল্লাহ তোমাকে কোন বিপদে ফেলেন তাহলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে, এ বিপদ দূর করতে পারে। আর যদি তিনি তোমার কোন মঙ্গল চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করেন এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

হে মুহাম্মাদ! বলে দাও, "হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এসে গেছে। এখন যারা সোজা পথ অবলম্বন করবে তাদের সোজা পথ অবলম্বন তাদের জন্যই কল্যাণকর হবে। এবং যারা ভুল পথ অবলম্বন করবে তাদের ভুল পথ অবলম্বন তাদের জন্যই ধ্বংসকর হবে। আর আমি তোমাদের ওপর হাবিলদার হয়ে আসিনি।" হে নবী! তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে যে হেদায়াত পাঠানো হচ্ছে তুমি তার অনুসরণ করো। আর আল্লাহ ফায়সালা দান করা পর্যন্ত সবর করো এবং তিনিই সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী।

পদ্ধতি থেকে নিজেদের পদ্ধতি আলাদা করে নাও। তাওহীদের অনুসারীরা জীবনের কোন ক্ষেত্রে ও বিভাগেও শিরকের অনুসারীদের অনুসৃত পথে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে চলতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তাদের শিরকের অনুসারীদের পেছনে চলার তো প্রশ্নই ওঠে না এবং এভাবে পেছনে চলার পরও তাদের তাওহীদবাদের দাবী ও চাহিদা নিশ্চিন্তে পূরণ হতে থাকবে একথা কল্পনাই করা যায় না।

তারপর শুধুমাত্র সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শিরক (শিরকে জলী) থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়নি বরং অস্পষ্ট শিরক (শিরকে খফী) থেকেও পুরাপুরি ও কঠোরভাবে দূরে থাকারও আদেশ দেয়া হয়েছে। বরং অস্পষ্ট শিরক আরো বেশী বিপজ্জনক এবং তার ব্যাপারে সতর্ক থাকার প্রয়োজন আরো অনেক বেশী। কোন কোন অজ্ঞ ব্যক্তি অস্পষ্ট শিরককে হাল্‌কা শিরক মনে করে থাকেন। তারা ধারণা করেন, এ ধরনের শিরকের ব্যাপারটা সুস্পষ্ট শিরকের মত অতোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। অথচ অস্পষ্ট (খফী) মানে হাল্‌কা নয় বরং গুপ্ত ও গোপনে লুকিয়ে থাকা। এখন চিন্তা করার ব্যাপার হচ্ছে, যে শত্রু

দিন-দুপুরে চেহারা উন্মুক্ত করে সামনে এসে যায় সে-ই বেশী বিপজ্জনক, না যে কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বা বন্ধুর ছদ্মাবরণে এসে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছে সে-ই বেশী বিপজ্জনক? যে রোগের আলামত একেবারে পরিষ্কার দেখা যায় সেটি বেশী ধ্বংসকারক, না যেটি দীর্ঘকাল সুস্থতার ছদ্মাবরণে ভেতরে ভেতরে স্বাস্থ্যকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে সে-ই বেশী ধ্বংসকর? যে শিরককে প্রত্যেক ব্যক্তি এক নজর দেখেই বলে দেয় এটি শিরক তার সাথে তাওহীদী দীনের সংঘাত একেবারে মুখোমুখি। কিন্তু যে শিরককে বুঝতে হলে গভীর দৃষ্টি ও তাওহীদের দাবীসমূহের নিবিড় ও অতলস্পর্শী উপলব্ধি প্রয়োজন, সে তার অদৃশ্য শিকড়গুলো দীনের ব্যবস্থার মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে দেয় যে, সাধারণ তাওহীদবাদীরা তা ঘূণাক্ষরেও টের পায় না তারপর ধীরে ধীরে অবচেতন পদ্ধতিতে সে দীনের সার পদার্থসমূহ এমনভাবে খেয়ে ফেলে যে, কোথাও কোন বিপদ-ঘন্টা বাজাবার সুযোগই আসে না।